শেখ আবদুল হাকিম

বলো কী অপরাধ

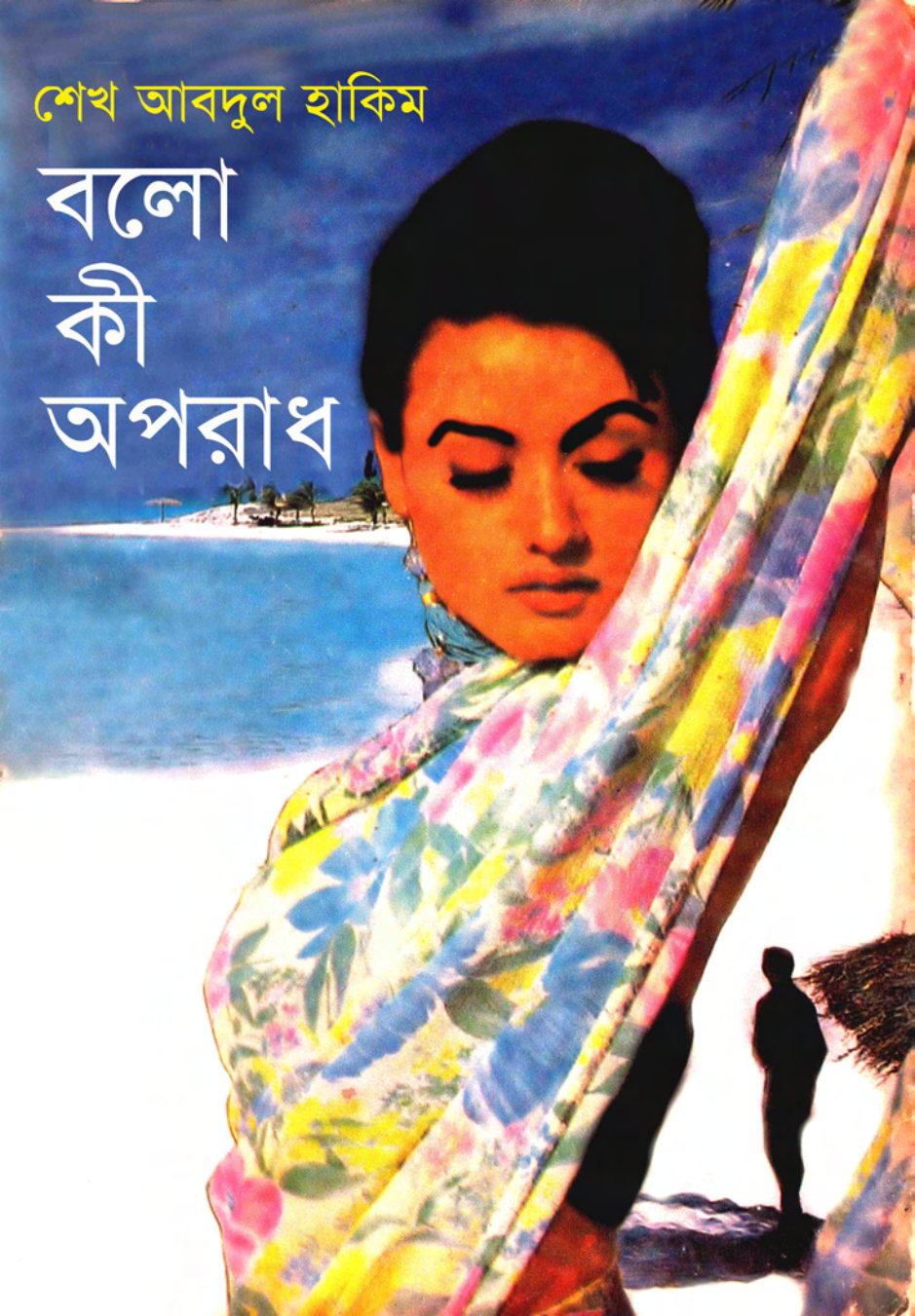

সেবা রোমান্টিক

বলো কি অপরাধ

শেখ আবদুল হাকিম

নিচে দিগন্তবিস্তৃত সৈকত আর সাগর, পাহাড়ের মাথায়
গভীর বনভূমি, বনভূমির কিনারায় বিশাল এক
শ্বেতপাথরের প্রাসাদ।
সেখানে বাস করে বিষণ্ন এক রমণী।
কত বছর আগে এক পলকের জন্যে কেউ
একজন দেখেছিল তাকে,
তারপর আর ভুলতে পারেনি। সেই ভুলতে না পারার সূত্র ধরে
তৈরি হয়েছে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মিঠেকড়া
এক প্রেম-কাহিনী। পেয়েও যদি হারাতে হয়,
তার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।
তবে হারিয়ে ফিরে পাবার আনন্দেরও বুঝি কোন
তুলনা হয় না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা রোমান্টিক

বলো কী অপরাধ

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-0173-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BALO KEE APORADH
A Romantic Novel
By: Sheikh Abdul Hakim

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

বলো কী অপরাধ

এক

তিনকন্যায় যারা না এসেছে তাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না কি তার মহিমা। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ, বলা হয় পৃথিবীর দীর্ঘতম সাগরসৈকত, তারই মাঝামাঝি জায়গায় এই এক টুকরো চিরহরিৎ স্বর্গ। সাগরের কোল ঘেঁষে গাঢ় সবুজ গাছপালায় ঢাকা পাশাপাশি তিনটে মাটির পাহাড়, দু'পাশের দুটো সমান উঁচু, মাঝখানেরটা একটু খাটো ও স্থূল। সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করতে পারলে পর্যটন ব্যবসা থেকে তিনকন্যা বছরে কত কোটিই না আয় করতে পারে, কিন্তু জাপান প্রবাসী এক উচ্চাকাঙ্ক্ষি ও স্বপ্নদর্শী তরুণ ছাড়া এ-ব্যাপারে আর কারও কোন মাথাব্যথা নেই। পর্যটক দু'একজন এদিকে পথ ভুলে চলে আসে, তারা ধরে নেয় পাহাড় তিনটের জন্যেই এই নামকরণ। তবে তাদের জানার সুযোগ হয় না যে পাহাড়গুলোর একটার মাথায় রক্ত-মাংসের তিন সুন্দরী কন্যাও বাস করে, এবং ওদের জন্মের আগে এই এলাকার নাম তিনকন্যা ছিল না। তিন পাহাড়ের তিন দিকে বিশাল এলাকা জুড়ে গভীর বনভূমি, বন্য হাতি আর শুকরের উপদ্রব এমনই মারাত্মক যে কোন কালেই এদিকটায় লোকবসতি গড়ে ওঠেনি। পাহাড়গুলোর সামনের দিক একদম খাড়া, তবে প্রতিটি পাহাড়ের ডান ও বাম দিকে বিস্তীর্ণ ঢাল আছে, আছে মাটি কেটে তৈরি করা পথ ও ছোট ছোট ধাপ। সৈকতে দাঁড়িয়ে অবশ্য এই পথ বা ধাপ সহজে দেখা যায় না, ঝোপ আর গাছে ঢাকা থাকে।

পাহাড়ের গোড়া থেকেই সৈকত শুরু হয়নি, প্রায় দু'শো গজ চওড়া ও দু'পাশে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঘাস মোড়া সবুজ মাঠ আছে। তবে ফুটবল খেলার আয়োজন করা যাবে না, জমিন এখানে সমতল নয়, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তারপর শুরু হয়েছে সৈকত, তারও বিস্তৃতি দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে। বালির এই বিস্তারও কম চওড়া নয়, তিনশো গজ তো হবেই। এখানে একটা কাঠের জেটি ছাড়া আর কিছু নেই। সৈকতে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকালে দিগন্ত পর্যন্ত শুধুই অথৈ জলরাশি। মাঝে মধ্যে জেলেদের নৌকা বা দু'একটা জাহাজ-স্টীমার দেখা যায়, অনেক দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। তবে সাগরের দিকে পিছন ফিরে আকাশের দিকে মুখ তুললে চোখে পড়বে এলাকার শ্রেষ্ঠ বিস্ময়—শ্বেতবসনা।

শ্বেতবসনা মর্মর পাথরের তৈরি একটা প্রাসাদ, মাঝখানের পাহাড়টার মাথায় বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনকন্যার হয়তো অন্য একটা নাম ছিল, তবে মানুষ আজ তা ভুলে গেছে। কে জানে, প্রাসাদটারও হয়তো একটা নাম ছিল। থাকাই স্বাভাবিক, কারণ চারদিকে এক দেড়শো মাইলের মধ্যে এত সুন্দর ও বড় আকৃতির প্রাসাদ আর একটাও দেখতে পাওয়া যায় না। শোনা যায় তিনশো বছর আগে তৈরি করা হয় এটা, তৈরি করেন বাগদাদ থেকে আসা একজন ব্যবসায়ী। পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দর থেকে জাহাজে করে পণ্য আনতেন তিনি, বিক্রি করতেন চট্টগ্রাম ও আরকান অঞ্চলে। দীর্ঘ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করেন তিনি, এক সময় বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। তরুণ বয়েসে আয় করা এই ধন-সম্পদ মধ্যবয়েসে তাঁকে ভোগবিলাসী করে তোলে। একদিন শিকারে এসে সৈকত ঘেঁষা পাহাড় তিনটে দেখেন তিনি, এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। সিদ্ধান্ত নেন, বছরের একটা সময় এখানে তিনি কাটাবেন। বিদেশ থেকে শ্বেত পাথর আমদানি করা হয়, পাহাড় কেটে তৈরি করা হয় অসংখ্য ধাপ। শ্বেত

পাথর ছাড়াও গ্র্যানিট আনা হয় ভারত থেকে। ধীরে ধীরে তৈরি হয় তাঁর শখের প্রাসাদ। সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশটা কামরা আছে দুই তলা প্রাসাদে। সামনের অংশ, বারান্দাসহ, পুরোটাই মর্মর পাথরে তৈরি। প্রতিটি কামরা, দেয়াল, খিলান ও প্রাচীর তৈরি হয় গ্র্যানিট পাথরে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বা অন্য কোন বিপদের কথা মনে রেখে প্রাসাদের নিচে আশ্রয় নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৈরি হবার পর প্রাসাদটা হয়ে ওঠে নারী সম্ভোগের অভিশপ্ত ঠিকানা। বছরের একটা সময় বোগদাদী ব্যবসায়ী তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এখানে আনন্দ-ফুর্তি করতে আসতেন। দূর দূরান্ত থেকে ধরে নিয়ে আসা হত সুন্দরী মেয়ে। সুরা আর সিদ্ধির নদী বয়ে যেত। তখন নাকি অনেক মেয়ে এই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সীমানা প্রাচীরটা সেজন্যেই পরে আরও উঁচু করা হয়। তাঁর আমলে মোট তিনবার আগুন লাগে প্রাসাদে। দু'বার লাগে নির্যাতিত মেয়েরা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করতে যাওয়ায়। এরপর একটা স্বপ্ন দেখে ব্যবসায়ী নিজেই তাঁর প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। আগুন ধরিয়ে প্রাসাদ থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে যান তিনি, জীবনে আর কোনদিন ফেরেননি। শোনা যায় পরে তাঁকে আরকান অঞ্চলে ফকিরী বেশে দেখা গেছে, পথ-ঘাটে ও বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। কবে তাঁর মৃত্যু হয়, কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয় ইত্যাদি কিছুই আর জানা যায়নি।

তিন তিনবার আগুন লাগলেও প্রাসাদটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, প্রতিবারই তা সময় থাকতে নিভিয়ে ফেলা হয়। শেষবার অবশ্য নিভিয়ে ফেলার কেউ ছিল না, দায়িত্বটা পালন করে প্রকৃতি স্বয়ং। ব্যবসায়ী একবস্ত্রে চলে যাবার পর মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল।

সাদা প্রাসাদ বারবার হাতবদল হতে থাকে, এক সময় নাকি জলদস্যুরাও এটা দখল করে বসে। অবশেষে সওদাগর আলি হায়দার সরকারের কাছ থেকে নীলামে প্রাসাদটা কেনেন, সে-ও আজ থেকে

তেইশ-চব্বিশ বছর আগের কথা। তাঁর অসুস্থ প্রথম স্ত্রীকে ডাক্তাররা হাওয়া বদলের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই জায়গার সন্ধান পান তিনি। দেখেই পছন্দ হয়ে যায়। কেনার দু'বছর পর পরিত্যক্ত প্রাসাদ ও নিচের কাঠের জেটি মেরামত করা হয়। সাগরের তাজা বাতাসে তাঁর স্ত্রী খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখানেই দু'বারে তিনকন্যার জনক হন ভদ্রলোক। স্ত্রী উম্মে কুলসুম সাদা কাপড় পরতে ভালবাসতেন, সে-কথা মনে রেখে প্রাসাদের নামকরণ করেন শ্বেতবসনা।

আলি হায়দার ব্যবসায়ী মানুষ, বছরের বেশিরভাগ সময় ইংল্যাণ্ডে থাকতে হয় তাঁকে, তাঁর পরিবারের ঠিকানা হওয়া চাই আধুনিক নাগরিক সুবিধে ও দ্রুতগতি যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে এমন একটা শহর। এদিক থেকে তিনকন্যা বসবাসের জন্যে একদমই অচল। কাছাকাছি জেলেদের কোন গ্রাম বা আদিবাসীদের বসতি না থাকায় রাস্তা-ঘাট তৈরি হয়নি। কোনরকম যাতায়াত ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। প্রথমবার এসে মাত্র তিন মাস ছিলেন, তার বেশি টিকতে পারেননি। কিন্তু চট্টগ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন উম্মে কুলসুম। এবার তার যক্ষ্মা ধরা পড়ল। ডাক্তাররা বললেন, এ রোগের ভাল কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, সেবা-যত্ন এবং হাওয়া বদলই এখন যদি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ইতিমধ্যে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন তিনি, ফলে তাঁর প্রাণের ঝুঁকি এখন অনেক বেশি। বাধ্য হয়েই আবার এখানে ফিরে আসতে হলো আলি হায়দারকে।

এবার তিনি দীর্ঘদিন বসবাসের ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নিয়ে এলেন। আদিবাসী একটা রাখাইন ও একটা চাকমা পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, চাষবাসের সুযোগ দেয়ার কথা বলে তাদেরকে এখানে বসবাসের জন্যে রাজি করা হলো। বড়সড় একটা সাম্পান কিনলেন, নাম দিলেন রাজহংস, ইংল্যাণ্ড থেকে ইঞ্জিন কিনে এনে ফিট করলেন তাতে,

চালাবার দায়িত্ব দিলেন কানু শেখ নামে এক প্রৌঢ় লোককে। কানু শেখের স্ত্রী মারা গেছে, একমাত্র ছেলে মান্না শেখ নৌবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, সংসারে আর কেউ নেই তার। ঠিক হলো, সওদাগর পরিবারের লোকজন ও মাল-পত্র আনা-নেয়ার কাজ করবে রাজহংস, বাকি সময় কক্সবাজার বা টেকনাফের দিকে ভাড়া খাটবে, যা আয় হবে সবই পাবে কানু শেখ। বাঙ্গালী আরও তিন-চারটে কৃষক পরিবারকে পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিতে ঘর-বাড়ি তৈরি করে দিলেন, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমিও বের করা হলো। চাষবাস থেকে যা আয় হবে সবই কৃষক পরিবারগুলো পাবে। বিনিময়ে সওদাগর পরিবারকে ডিম, দুধ, মাখন, ছানা, মুরগি, মাংস আর সব্জি সরবরাহ করবে তারা। খামার গড়তে যা পুঁজি লাগে তা-ও হায়দার সাহেবই দান হিসেবে যোগান দিলেন।

সব গোছগাছ করে দিয়ে আবার বাণিজ্যে বেরুলেন সওদাগর আলি হায়দার। ইতিমধ্যে তাঁর প্রথম দুই যমজ মেয়ে শিরিন আর তারিনের জন্ম হয়েছে। কচি দুই মেয়ের কথা ভেবেই দু'বছর পর ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার সময় একটা জেনারেটর কিনে আনলেন তিনি। শ্বেতবসনা থেকে রাত্রির অন্ধকার এতদিনে দূর হলো। পরের বছর আরও একটা কন্যাসন্তানের জনক হলেন আলি হায়দার, নাম রাখলেন আইরিন। তিন মেয়ে হওয়ার পর তিন পাহাড়ের নাম হলো তিনকন্যা। তারপর কিভাবে যেন গোটা এলাকার নামও তিনকন্যা দাঁড়িয়ে গেল।

রোগ ও দুর্বল স্বাস্থ্য সন্তান উৎপাদনের অনুকূল ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামী ও ডাক্তারদের মতামতকে উপেক্ষা করে দু'বার গর্ভবতী হয়েছিলেন উম্মে কুলসুম। তাঁর একটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্বামীকে একটা পুত্রসন্তান উপহার দেবেন। হয়তো বা আরও কিছুদিন বাঁচতেন, কিন্তু পরে এক সময় তার এই আকাঙ্ক্ষাই কাল হয়ে দেখা দেয়।

আলি হায়দারের ইচ্ছে ছিল মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবন

ও দুনিয়াদারি বোঝার সুযোগ করে দেবেন। এ-ব্যাপারে প্রথম থেকেই অত্যন্ত সতর্ক তিনি। শিরিন আর তারিনের বয়েস যখন পাঁচ, বাড়ি কিনে কক্সবাজারে উঠে এলেন। স্কুলে ভর্তি হলো দুই বোন, তখন থেকেই প্রতিটি সাবজেক্টের জন্যে আলাদা গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হলো। যমজ বোনদের চেয়ে তিন সাড়ে তিন বছরের ছোট আইরিন, এক সময় তাকেও স্কুলে ভর্তি করা হলো। গোছানো সংসার ফেলে এসেছেন, এই অজুহাতে বছরে চার-পাঁচ বার তিনকন্যায় ছুটে যান উম্মে কুলসুম। যদিও একা একা দু'চারদিনের বেশি টিকতে পারেন না, কক্সবাজারে মেয়েদের কাছে ফিরে আসেন আবার। তবে গ্রীষ্মের ছুটি, রোজার ছুটি আর ফাইন্যাল পরীক্ষার পর সবাইকে নিয়ে বেশ ক'টা দিন তিনকন্যায় থাকা হয়।

পুত্রসন্তান একটা চাই-ই তাঁর, কাজেই আবার তিনি কনসিভ করলেন। ইতিমধ্যে আরও রোগা হয়ে গেছেন, পরিশ্রমের কোন কাজই করতে পারেন না। স্বামী যে তাঁকে নিয়ে সুখী নয়, এটা তিনি অনেক বছর ধরে উপলব্ধি করছিলেন। বহু বার বহুভাবে মিনতি করেছেন, স্বামী যেন আরেকটা বিয়ে করেন। সুখী নন, একথা বললে হাসেন আলি হায়দার, স্বীকার করেন না। আর দ্বিতীয় বিয়ের কথা তুললে রেগে যান।

হলো পুত্রসন্তানই, কিন্তু মরা; এবং উম্মে কুলসুমও বাঁচলেন না।

স্ত্রী মারা যাবার পর তিন মেয়েকে নিয়ে সঙ্কটেই পড়লেন আলি হায়দার। বড় দুই মেয়ের বয়েস মাত্র দশ, ছোটটার ছয় সাড়ে ছয়, কে তাদেরকে দেখেশুনে রাখবে? আত্মীয় ও বন্ধুরা আবার বিয়ে করতে বললেন। আলি হায়দার রাজি হলেন না। তাঁর এই রাজি না হবার কারণ জানা যাবে আরও বেশ কয়েক বছর পর। আপাতত সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিন মেয়েকেই চট্টগ্রামের নামকরা একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন বিদেশে।

প্রতি বছর একটা ছক দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েদের লম্বা ছুটিগুলোয়

দেশে ফিরে আসেন আলি হায়দার, ওদেরকে নিয়ে তিনকন্যায় ওঠেন। লেখাপড়ার চাপ থাকলে গৃহশিক্ষকদেরও সঙ্গে করে আনা হয়, এমনকি এক সময় আবাসিক একজন ডাক্তারও রাখা হয়। ছুটি শেষ হলে মেয়েদেরকে বোর্ডিং স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আবার বিদেশে পাড়ি জমান তিনি। এভাবেই বছরগুলো কেটে গেল। শিরিন আর তারিন এস.এস.সি. পাস করল, ভর্তি হলো কলেজে, কলেজ থেকে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে পা রাখল; আইরিনও স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিরিন আর তারিন উপলব্ধি করল, ওদের আব্বু আসলে অনেক দূরের মানুষ। তিনি শুধু দায়িত্ব পালন করেন। ভালও হয়তো বাসেন, তবে কতটা বলা মুশকিল। বছরে দু'তিনবার দেখা হয়, তা-ও মাত্র দিন কয়েকের জন্যে। ছুটি যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে, আব্বুর বিদেশে যাবার অস্থিরতা লক্ষ করে মনে মনে বিস্মিত হয় ওরা। তারপর ওরা এক দিন একটা ফটো দেখল। স্বর্ণকেশী এক শ্বেতাঙ্গিনীর ছবি, পাওয়া গেল আলি হায়দারের বালিশের তলায়। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করল দুই বোন, তবে আব্বু বা আইরিনকে এ-ব্যাপারে কিছুই বলল না। যদিও ওদের আচরণে কিছু একটা প্রকাশ পেয়ে যায়, কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারেন আলি হায়দার। এক রাতে তিন মেয়েকে ডাকলেন তিনি, সবার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, তারপর নিজের জীবনের একটা গোপন অধ্যায় মেলে ধরলেন ওদের সামনে।

স্বর্ণকেশী শ্বেতাঙ্গিনীর নাম কার্লা। বিশ-বাইশ বছর আগে লণ্ডনে তার সঙ্গে আলি হায়দারের পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, তারপর প্রণয়, এবং সবশেষে বিয়ে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে জানে, কোন রকম গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না, কাজেই মন খুলে সব কথা বলতে তাঁর বাধল না। বিয়ের কথাটা এতদিন প্রকাশ করেননি, কারণ মেয়েরা সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে চেয়েছিলেন তিনি। আজ সব কথা খুলে বলছেন, তার অন্য কারণও আছে। কি সেই কারণ? না, কার্লাকে দেশে নিয়ে আসতে চান তিনি। তাঁর ইচ্ছে সবাই মিলে একত্রে বসবাস করবেন। অবশ্য তা সম্ভব কিনা নির্ভর করবে কার্লাকে ওরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে কিনা তার ওপর, এবং কার্লা এই দেশ ও তাঁর তিন মেয়েকে কিভাবে নেবে তার ওপর। সবশেষে বললেন, কার্লা যদি এ দেশের পরিবেশ পছন্দ না করে, সবাইকে নিয়ে লণ্ডনে চলে যাবার কথাও বিবেচনা করে দেখবেন তিনি।

এ-সব শুনে আইরিন তো নাচতে শুরু করল, পারলে সে এখুনি লণ্ডনে চলে যায়। তবে শিরিন ও তারিন কোন মতামত দিল না। আব্বুর প্রশ্নের জবাবে দু'জনেই তারা জানাল, ঠিক আছে, আগে ওঁনাকে দেখি, তারপর ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। ওরা দুই যমজ বোন হলেও, কোন ব্যাপারে কখনোই একমত হতে পারে না, এবারই শুধু ব্যতিক্রম দেখা গেল। আব্বুকে বলল না, তবে কি করা হবে তা দু'জনেই ওরা মনে মনে জানে। ছবিতে দেখেই কার্লা সম্পর্কে বিরূপ একটা ধারণা জন্মেছে, এই মহিলার সঙ্গে বসবাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ছবিতে কার্লার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি বলে মনে হয়, অথচ তার পরনে কাপড় এত কম যে তাকাতেও লজ্জা করে।

ঠিক হয়েছিল তিন মাস পর তিনকন্যায় আসবে কার্লা। এলও তাই। চট্টগ্রাম ভার্সিটি খোলা, শিরিন ও তারিনের সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পরীক্ষা সামনে, তাসত্ত্বেও হোস্টেল ছেড়ে ওদেরকেও তিনকন্যায় আসতে হয়েছে। কলেজে মাত্র ভর্তি হয়েছে আইরিন, তাকেও হোস্টেল থেকে আনা হয়েছে।

তিনকন্যায় পনেরো দিন হলো রয়েছে কার্লা। আজই তার শেষ দিন এখানে, চট্টগ্রাম ও ঢাকা হয়ে ফিরে যাবে লণ্ডনে। সে তার নিজের মতামত জানিয়ে দিয়েছে, এ দেশ তার ভাল লাগলেও, এখানে চিরকাল

থেকে যাবার কথা সে ভাবতেই পারে না। গত পনেরো দিন রোজই তাকে মদ খেতে দেখা গেছে। টু পীস বিকিনি পরে শুয়ে থেকেছে সৈকতে। আলি হায়দারের মেয়েরা সামনে থাকুক বা না থাকুক, স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে।

কার্লার মতামত জানার পর আলি হায়দার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনিও এখন থেকে লণ্ডনে স্থায়ী আসন গাড়বেন। শুধু যে কার্লার আকর্ষণে, ব্যাপারটা তা নয়। ইংল্যাণ্ডে প্রচুর সয়-সম্পত্তি করেছেন তিনি, সে-সব দেখাশোনার জন্যেও ওখানে তাঁর থাকা দরকার। আইরিনকে বোঝাতে হয়নি, সে তো আব্বুর সঙ্গে যাবার জন্যে আগে থেকেই পাগল। তবে শিরিন আর তারিনকে অনেক বুঝিয়েও এখনও তিনি রাজি করতে পারেননি।

আজ সেই দিন, বড় দুই মেয়ের চূড়ান্ত মতামত জানতে চাইবেন তিনি, শেষ একবার বোঝাবার চেষ্টা করবেন।

সবে ভোর হয়েছে, এখনও সূর্য ওঠেনি। একা একা জেটি থেকে বহু দূরে চলে এসেছে শিরিন, পানির কিনারা ঘেঁষে খালি পায়ে বালির ওপর হাঁটছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে লম্বা জেটিটাকে সরু পেন্সিলের মত দেখাল। জেটির শেষ মাথায় কালো একটা ছোপ লক্ষ করল সে, পানিতে ওঠা-নামা করছে, চিনতে না পারায় সামান্য একটু কুঁচকে উঠল জোড়া ভুরু। রাজহংস নাকি? না, তা কি করে হয়, এই ভোর বেলা রাজহংস কেন আসবে। তারপর ভাবল, আজ তো কার্লা ফিরে যাবে, আব্বু হয়তো মান্না শেখকে ভোরেই আসতে বলে দিয়েছেন। জেটির দিকে আবার পিছন ফিরে নিজের কাজে মন দিল শিরিন। বাড়ির দুটো ঘর বিচিত্রদর্শন সব ঝিনুকে ভরে গেছে, তারপরও কুড়োবার শখটা মেটে না তার। তিনকন্যায় থাকলে রোজ ভোর বেলা সৈকত ধরে হাঁটা চাই। আজকাল অবশ্য অনেক বাছবিচার করে সে,

চমকপ্রদ বা অদ্ভুত আকৃতির না হলে ঝুড়িতে কোন ঝিনুক তোলে না।

আজ অবশ্য একেবারেই মন নেই কাজটায়, শুধু অভ্যাসবশত এসেছে। রাতে ভাল ঘুমাতেও পারেনি সে, সারাক্ষণ চিন্তা করেছে সকালে আব্বুর সামনে দাঁড়িয়ে কিভাবে কথাটা বলবে। আব্বু যদি জেদ ধরেন, ওদের দুই বোনকেও কঠিন হতে হবে। তারিনের সঙ্গে কথা হয়েছে তার, সে-ও কোন অবস্থাতেই লন্ডনে যেতে রাজি নয়। কিন্তু শুধু রাজি না হলেই তো চলবে না, আব্বুর অসংখ্য প্রশ্নের জবাবও তো দিতে হবে। মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই, তারা দুই বোন দেশে থাকবে কিভাবে? লেখাপড়া করছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের বয়েসও তো হয়েছে, তাই না? কে তাদের জন্যে পাত্র দেখবে? বিয়ের আয়োজনই বা কে করবে? ধর্মঘট, মারামারি ইত্যাদি কারণে প্রায়ই খালি হয়ে যায় হোস্টেল, তখন শুধু ওরা দুই বোন তিনকন্যায় থাকবে কিভাবে? তাদের চলবেই বা কিভাবে? বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত যদি স্থগিত থাকে, লেখাপড়া শেষ হবার পর তো আর দেরি করা যাবে না। মা মারা গেছে, বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বিদেশে চলে গেছেন, এরকম পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া সহজ হবে না।

মোটামুটি সব প্রশ্নের জবাবই তৈরি করে রেখেছে শিরিন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আব্বুকে সন্তুষ্ট করা যাবে কিনা। বিয়ের প্রসঙ্গটাই সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে, জানে সে। এ ব্যাপারে তার নিজের কোন সমস্যা নেই, কারণ মৃদুলকে ভালবাসে সে, ওর সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। কিন্তু মৃদুলের কথা আব্বুকে বলা যাবে না। আব্বুকে সে চেনে, তাঁর সমান ধনী পরিবারের ছেলে না হলে পাত্র হিসেবে কাউকেই তিনি পছন্দ করবেন না। কিন্তু মৃদুল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ওদেরকে ধনী বলা যাবে না। আব্বু দেশে থাকলে হঠাৎ একদিন মৃদুলকে বিয়ে করে ফেলত সে, আগেভাগে কাউকে কিছু বুঝতে দিত না। বিয়ে হয়ে গেলে কার আর কি করার থাকে। এখন যখন ঠিক হয়েছে আব্বু বিদেশেই থাকবেন, নিজের

বিয়ের ব্যাপারটাকে সে কোন সমস্যা হিসেবে দেখছে না। তবে তারিনকে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কোন ছেলেকেই তার মনে ধরে না, অথচ সম্পর্ক রাখবে এক হাজার একটা ছেলের সঙ্গে। মুখেও তার কোন কথা আটকায় না, ছেলেগুলোকে স্পষ্টই বলে দেয়, মেলামেশা করলে কি হবে, তোমাদের কাউকেই আমি ভালবাসব না বা বিয়ে করব না। আমাকে পেতে হলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তার কিছুই তোমাদের কারও মধ্যে নেই।

যমজ ঠিকই, তবে দু'জন দুই মেরুতে বাস করে, কখনোই কোন ব্যাপারে মতের মিল হয় না। শিরিন আধ ঘণ্টা আগে জন্মেছে, কিন্তু ভাব দেখে মনে হবে তারিনই বড়। সে, শিরিন, শান্ত ও বিষণ্ণ প্রকৃতির মেয়ে—পাহাড়, নদী, গাছপালা, কবিতা ইত্যাদি ভালবাসে, বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী; চুপচাপ একা থাকতেই পছন্দ করে। তারিন ছটফটে, সারাক্ষণ নতুন নতুন আইডিয়া গিজগিজ করছে মাথায়, বিজ্ঞানের ছাত্রী, কখন কি করে বসে বলা মুশকিল। প্রায়ই সে কৌতুকের ছলে শিরিনকে শুনিয়ে দেয়, 'সবাই জানে আমি একটু ঘুমকাতুরে, আর তুইও তো সেই সুযোগটাই নিয়েছিস। আমাকে ঘুমাতে দেখে চুপিচুপি আগেভাগে বেরিয়ে এসেছিস আম্মুর পেট থেকে।'

শিরিন হাসে, কথা বলে না। নিজে শান্ত হলে কি হবে, তারিনের দস্যিপনা অসম্ভব ভাল লাগে তার।

তারিন বলে, 'তোর সঙ্গে সব ব্যাপারে জিতি আমি—রেজাল্ট ভাল করি, স্পোর্টসে ভাল করি, তোর চেয়ে দেখতেও আমি বেশি সুন্দর, তোর যেখানে স্বপ্ন বলতে কিছুই নেই আমার অ্যামবিশন সেখানে আকাশ ছুঁতে চায়। এখন তুইই বল, কি করে আমি তোর চেয়ে ছোট হতে পারি? আসলে তুই আমাকে ঠকিয়েছিস, তোর কূটকৌশলের কাছে আমি হেরে গেছি। কিন্তু ওই একবারই, আর পারবি না।'

শিরিন তাকে একদিন বলল, 'অন্তত একটা ব্যাপারে তোর চেয়ে

এগিয়ে আছি আমি। একজনকে ভালবাসি, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুই তো আজ পর্যন্ত কাউকে পছন্দই করতে পারলি না।'

শুনে হেসেছে তারিন। তার জবাব ছিল, 'মৃদুলকে আমি খারাপ ছেলে বলছি না। ছেলে সত্যি হয়তো ভাল সে। কিন্তু খুঁতগুলোর কথা ভেবে দেখ।'

রেগে গেছে শিরিন। 'কি খুঁত? মৃদুলের আবার কি খুঁত দেখলি তুই?'

'খালি মিটিমিটি হাসে, সহজে কোন কথা বলতে চায় না। চুপ শয়তান বললে তুই খেপে যাবি, হয়তো অকারণে নিন্দা করাও হবে, তাই বলছি না। তারপর ধর, ওদের টাকা নেই। কবে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তার অপেক্ষায় থাকতে হবে তোকে। তাছাড়া, একা মৃদুল ভাই চাকরি করলেও হবে না, তোকেও দশটা-পাঁচটা অফিস করতে হবে, তা না হলে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে না। ভুলে যাবি না, আরাম-আয়েশে মানুষ হয়েছি আমরা। আরও আছে। তোকে নিয়ে কোন দিনই মৃদুল ভাই একা সংসার পাততে পারবে না, কারণ তার আব্বু বুড়ো হয়ে গেছেন, তিনি অবসর নিলে ভাই আর বোনগুলোর দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপবে। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মৃদুল ভাইয়ের বড় বোনটিকে নিয়ে। আমার ধারণা, কোনদিনই তার বিয়ে হবে না।'

'তোকে বলেছে।'

'দেখিস না! মহিলার কত বয়েস জানিস? ওরা বলে ত্রিশ, কিন্তু আসলে পঁয়ত্রিশের কম নয়, মৃদুল ভাইয়ের চেয়ে অন্তত আট বছরের বড়। বলতে নেই, চেহারা আর আকৃতির কথা চিন্তা করে দেখ। প্রকাণ্ড এক হস্তিনী, সারাদিন মুখ চলছে, খেয়ে খেয়ে ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে গেছে। তার ওপর ভূতের মত কালো। আল্লাহ মাফ করবে, শুধু কালো আর মোটা নয়, সারা মুখে অসংখ্য গর্ত, পক্সের দাগ। এই মেয়েকে কে বিয়ে করবে, বল? ধরে রাখ, তোদের সংসারে চিরকালই থেকে যাবে

সে।'

'থাকে থাকবে, তাতে তোর কি?'

তারিনের কথায় যতই রাগ করুক শিরিন, তার কিছু কিছু কথা যে সত্যি তা সে-ও জানে। মৃদুলের বড় বোন তাসমিনার বিয়ে হবার সম্ভাবনা সত্যি নেই বললেই চলে। কিন্তু একটা মেয়ে দেখতে খারাপ বলে তাকে তো আর ফেলে দেয়া যাবে না। মৃদুলকে সে সত্যি ভালবাসে, কাজেই মৃদুলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাগুলোকেও তার নিজের বলে মেনে নিতে হবে। তাসমিনা আপা যদি চিরকাল ভাইয়ের সংসারে থেকেই যায়, শিরিন তাতে কিছুই মনে করবে না। তবে একটা ব্যাপারে তার অসন্তোষ আছে। তাসমিনা আপা লেখাপড়া করল না। মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে তাকে শিরিন বোঝায়, বয়েস কোন ব্যাপার নয়, ইচ্ছে থাকলে যে-কোন বয়েসে লেখাপড়া শুরু করা যায়। ক্লাস করার দরকার কি, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম অন্তত এস.এস.সি.টা পাস করো। খারাপ লাগলে বোরকা পরে বাইরে বেরুতে পারা যায়। কিন্তু তাসমিনা আপা চুপ করে বসে থাকে, জবাব দেয় না। তার দুঃখ খুবই বোঝে শিরিন, তাই বেশি কিছু বলতেও তার বিবেকে বাধে।

নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে মৃদুলকে জোর দিয়ে কোনদিনই কিছু বলেনি শিরিন। বলেনি, কারণ এখুনি যে বিয়েটা হওয়া সম্ভব নয় তা সে বোঝে। অনার্স পাস করে বেরুতে আরও তিন বছর বাকি তার। মৃদুল বেরুবে এক বছর আগে। মাস্টার্স করার ইচ্ছে নয় ওর, কারণ সংসারের হাল ধরার জন্যে চাকরি করতে হবে ওকে। ঠিক হয়েছে এক বছর পর শিরিনও লেখাপড়া শেষ করবে, সে-ও মাস্টার্স করবে না, তার বদলে চাকরি ও বিয়ে করবে। দু'জনের আয়ে সংসারটা ভালভাবেই চালিয়ে নিতে পারবে ওরা।

পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলে সব কথাই বলা যায়। মৃদুলও তাই তার মনের কোন কথা শিরিনের কাছে কোনদিন গোপন

করে না। কথায় কথায় একদিন সে জানিয়েছে, তাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নয় বলে নিজেকে সে ছোট মনে করে না। ধনী নয় বলে তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আরও জানিয়েছে, সে জানে শিরিন বিরাট ধনী পরিবারের মেয়ে, কিন্তু তাকে ভালবাসার ব্যাপারে সেটার কোন ভূমিকা নেই। মৃদুল কোনদিন যৌতুক দাবি করবে না। এমন কি পারিবারিক সূত্রে শিরিন যদি কোন সম্পত্তি পায়ও, তাতেও কোনদিন হাত দেবে না। আত্মবিশ্বাস আছে, একদিন ঠিকই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে ও।

সেরকম শিরিনও তার মনের কথা জানিয়েছে মৃদুলকে। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে তার আব্বুর টাকায় খাচ্ছে-পরছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের পর তাঁর কোন টাকা বা সাহায্য সে নেবে না। কারণটাও ব্যাখ্যা করেছে সে। তার আব্বু নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, কার্লাকে তিনি বিয়ে করেছেন আজ থেকে বিশ-বাইশ বছর আগে। শিরিন আর তারিনের বয়েসও বিশ। আর আইরিনের খুব বেশি হলে সতেরো। তারমানে ওরা তিন বোন জন্ম নেয়ার আগেই ওদের মাকে কিছু না জানিয়ে কার্লাকে বিয়ে করে ফেলেছেন তিনি। এই ব্যাপারটাকে শিরিন বেঈমানী বলে মনে করে, আম্মু ও তাদের সঙ্গে স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আব্বু। কাজেই বিয়ের পর আব্বুর কোন টাকা বা সয়-সম্পত্তি সে নেবে না। এ-কথা শুনে মৃদুল কোন মন্তব্য করেনি। তবে জানতে চেয়েছে, তারিনেরও কি এই মত? সে-ও কি আব্বুর কিছু নেবে না? শিরিন জবাব দিয়েছে, ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। ও কি করবে তা আমার জানার দরকারও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিরিন। কোথায় যাচ্ছে সে, কেন যাচ্ছে? যতই অপরাধ করুন তিনি, জন্মদাতা তো বটেন, আজ শেষ দিন প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে সঙ্গ দেয়া দরকার নয় তার? সে আসলে দিনের শুরু থেকেই যতক্ষণ সম্ভব আব্বুর কাছ থেকে পালিয়ে

থাকার চেষ্টা করছে। নিজেকে তিরস্কার করল শিরিন, এতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয় তোমার। তিনি অন্যায় করলে করেছেন, তুমি কেন তা জেনেশুনে করতে যাবে? বয়েস হয়েছে তাঁর, এবার বিদেশে গিয়ে কবে ফিরবেন ঠিক নেই, আর হয়তো কোনদিন দেখাও হবে না।

ফিরে আসছে শিরিন। চোখ দুটো জ্বালা করছে। খানিক পর খেয়াল হলো, আজ সে এতদূরে চলে এসেছে যে জেটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগল তার। হাতের ঝুড়িটা একদমই হালকা, তবু ওটাকে অসম্ভব ভারি লাগছে। কখন সূর্য উঠেছে বলতে পারবে না, রোদে পুড়ে যাচ্ছে গা। সঙ্গে ওড়না নিয়ে বেরোয়নি, মুখের ঘাম মুছতে পারছে না। ঝুড়িটা পানির কিনারা থেকে খানিক দূরে নামিয়ে রাখল, চিরল চাকমাকে বললে সে এসে নিয়ে যাবে। তারপর মনে পড়ল, চিরল পুতুল নিয়ে কক্সবাজারে গেছে, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। ঠিক আছে, বাড়িতে ঢোকার আগে মায়মা রাখাইনকে বলে রাখবে। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে তার, এত দূরে চলে আসা উচিত হয়নি। এখন রোদের মধ্যে হাঁটো! বাড়ি ফিরতে আটটার বেশি বেজে যাবে।

তারপর জেটিটা দেখা গেল। এক সময় রাজহংসকেও চিনতে পারল শিরিন। কাছাকাছি এসে মান্না শেখকে দেখতে পেল সে। কানু শেখের কথা মনে আছে তার, বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে। মান্না শেখ তারই ছেলে। নৌবাহিনীতে ছিল, অবসর নেয়ার পর রাজহংসের দায়িত্ব সেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাধারণত হপ্তায় দু'দিন তিনকন্যায় আসে সে, জেনে যায় কেউ কোথাও যাবে কিনা বা কারও কিছু লাগবে কিনা। রাজহংস বড় সাম্পান, ওটা ছাড়াও ছোট একটা ট্রলার আছে তাদের, জরুরী কোন কাছে রাজহংসকে পাওয়া না গেলে ব্যবহার করা হয়। আদিবাসিদের দুটো পরিবারকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে তিনকন্যায়, প্রয়োজনে তাদেরই কেউ ট্রলার চালায়।

রাজহংসের খোলা ডেকে বসে দড়িদড়া গোছগাছ করছে মান্না শেখ।

শিরিনকে দেখে কাচাপাকা একমুখ দাড়ি-গোঁফের ভেতর মুক্তোর মত সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। শিরিন জানতে চাইল, 'মান্না কাকু, আজ এত সকাল সকাল যে?'

'সওদাগর সাহেবের হুকম, মা। একজন মেহমানকেও আনতে হলো। তুমি ভাল তো, মা?'

'মেহমান, এই ভোর বেলা?' শিরিন অবাক। 'কে মেহমান?' কেবিনের দরজা খোলা দেখে উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরে কেউ আছে কিনা।

'কে···তা তো জানি না, মা। ঢাকা থেকে এসেছেন, দু'হপ্তা হলো কক্সবাজারের একটা হোটেলে উঠেছেন। সেই থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে অস্থির করে তুলেছিলেন আমাকে। তিন দিন আগে সাহেবের অনুমতি নিয়ে রাখি, কাল রাতে হোটেলে গিয়ে বলে আসি আজ ভোর অন্ধকার থাকতে রওনা হব আমি···।'

'নাম কি? আব্বুর সঙ্গে তার কি কাজ?'

মাথা নাড়ল মান্না শেখ। 'কিছুই আমি জানি না, মা। ওপরে উঠলে সব জানতে পারবে। উনি এখন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করছেন।'

'ফিরবেন কখন?'

'আবার যখন রাজহংস কক্সবাজারে যাবে। কখন যাবে সেটা সাহেব জানেন।'

কথা আর না বাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে এগোল শিরিন। তিন পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তে বুকে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করল সে। ডান দিকের পাহাড়টার নাম শিরিন, বাম দিকেরটা তারিন, মাঝখানে ওটা আইরিন। ওদের বাড়িটা আইরিনের মাথায়। এই বিশাল বাড়ি, নিচের সৈকত, সুবিশাল সাগর, বাড়ির পিছনে টুকরো টুকরো খেতজমি, বন-জঙ্গল, কাঁটাতারের বেড়া, বেড়ার ওদিকে গভীর বনভূমি, সবই অদৃশ্য একটা বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছে তাদেরকে। ছোটবেলা থেকে এই স্বর্গে মানুষ হয়েছে তারা, আনন্দ-বেদনার কত স্মৃতি মনে

পড়ে যায়। এখানে মারা গেছে ওদের মা। এই শান্তির নীড় ছেড়ে বলা যায় চিরকালের জন্যেই আজ চলে যাচ্ছেন তার আব্বু। তাদের কথা তিনি না ভাবুন, এখানে যে তাঁর স্ত্রীর কবর আছে সে-কথাও কি কোনদিন মনে পড়বে না? মনে পড়লে একবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না?

তারপর সে ভাবল, যা ঘটছে তা বোধহয় ভালর জন্যেই ঘটছে। আব্বু যদি থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিতেন, তার মানে দাঁড়াত তাঁর সঙ্গে কার্লাও এখানে থাকবে। কিন্তু কার্লার সঙ্গে সে বা তারিন বসবাস করতে পারত না। ওদের দুই বোনকে উঠতে হত কক্সবাজার বা চট্টগ্রামের বাড়িতে। বাপকে ছেড়ে এত কাছাকাছি অথচ পৃথক থাকাটা অবশ্যই ভাল দেখাত না, কারও জন্যে স্বস্তিকরও হত না।

ধাপ বেয়ে পাহাড়ে ওঠার সময় হাঁপাচ্ছে শিরিন। নিজেকে সে ধমক দিল, এরকম লাফিয়ে লাফিয়ে না উঠলেই তো হয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সেই ব্যথাটা আবার অনুভব করল সে। তিনকন্যায় শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের কোন বোনেরই থাকা হবে না। আইরিন লণ্ডনে চলে যাচ্ছে, দেশে হয়তো আর ফিরবেই না, ওখানেই বিয়ে করে স্থায়ী হয়ে যাবে। সে, শিরিন, বিয়ের পর অবশ্যই তিনকন্যা ত্যাগ করবে। বাকি থাকল তারিন। তিনকন্যা ওর একদমই পছন্দ নয়—টেলিফোন নেই, মোটরগাড়ি নেই, হোটেল-রেস্তোরাঁ নেই, পার্ক নেই, এখানে কি কোন সভ্য মানুষ থাকতে পারে? তারিনের ইচ্ছা কমপিউটর বিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে ব্যবসা করবে। অর্থাৎ শহরই হবে ওর ঠিকানা। তারমানে এত সাধের তিনকন্যা ফাঁকা হয়ে যাবে। আব্বুর প্রতি তার অভিমান আছে, তা না থাকলে মৃদুলকে সে বোঝাত, এসো তিনকন্যায় আমরা ঘর বাঁধি। কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। বিয়ের পর আব্বুর কোন সম্পত্তি সত্যি সে নেবে না। তাছাড়া, যদি নিতও, মৃদুলকে তিনকন্যায় থাকতে রাজি করানো যেত না। এখানে থাকলে চাকরি করা সম্ভব নয়। শুধু দু'জনের কথা ভাবলে চলবে না, মৃদুলের পরিবারের বাকি সবার

কথাও তো ভাবতে হবে। তারাও কেউ তিনকন্যায় থাকতে রাজি হত বলে মনে হয় না।

তবু, থাকা হোক বা না হোক, শ্বেতবসনা যদি সে কিনে নিতে পারত, বড় ভাল হত। ভাল হত মানে কি, তার চেয়ে সুখী মেয়ে পৃথিবীতে আর কেউ হত কিনা সন্দেহ। হেসে ফেলেছে শিরিন, গাছপালায় ঘেরা ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে, ভাবছে বাপের সম্পত্তি মেয়ে আবার কেনে কিভাবে?

এখনও সে হাসছে, আর তার গোপন হাসিটা একজনের চোখে ধরা পড়ে গেল। শুধু কি হাসিটা ধরা পড়ল! সমগ্র শিরিন উন্মোচিত হলো ওর সামনে। কোন একটা ব্যাপারে এই মাত্র হতাশ হতে হয়েছে ওকে, শিরিনের ঘামে ভেজা মুখের হাসি আর উদ্ভিন্নযৌবন সব ভুলিয়ে দিল। প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না, ও কি ভুল দেখছে চোখে? প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝখানে রক্ত-মাংসের কোন মেয়েকে এতটা মানাতে পারে? একটা ঘোরের মধ্যে মনে হলো, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে ও, শুধু মেয়েটাকে দেখতে পাবার আনন্দেই।

আর শিরিন? তার কি অবস্থা? লজ্জায় ও সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল সে। অচেনা আগন্তুক, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, সুঠাম শরীর, চোখ দুটোয় রাজ্যের মায়া, তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, অথচ তার গলায় ওড়না নেই! পালিয়ে বাঁচবে, সে পথও বন্ধ। কয়েক ধাপ ওপরে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে সুবেশী তরুণ। যতই সংকোচ বোধ করুক, ধড়ফড় করুক বুক, খুঁটিয়ে সবই লক্ষ করা হচ্ছে। ছেলেটার গায়ে ভারি সুন্দর ম্যাগাজিন শার্ট, কোমরের বেল্টে রূপোর মত চকচক করছে ময়ূর আকৃতির বকলস। জিনসটা নীলচে, প্রায় সাদা। কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা যে রোলেক্স, তা-ও দৃষ্টি এড়াল না। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, হাড়গুলো চওড়া, এক ফোটা চর্বি নেই কোথাও।

সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। কেউ নড়ছে না, কেউ কথা বলছে না।

এত পাখি, সারাক্ষণ কিচিরমিচির করে, অথচ আজ তারা টু-শব্দও করছে না। এমনকি নিচে সাগরও একদম শান্ত হয়ে গেছে। এক ফোঁটা বাতাস পর্যন্ত বইছে না।

শিরিনের সংবিৎ ফিরল দু'জনের মাঝখানে মৃদুল এসে দাঁড়াতে। মৃদুল, তার ভালবাসা। পরস্পরকে তারা কথা দিয়েছে। এই মুহূর্তে মৃদুল অদৃশ্য, কিন্তু শিরিনের মানসচক্ষে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অচেনা তরুণ যেমন চোখ ফেরাতে পারেনি, শিরিনও তাই। তবে মৃদুলকে দেখতে পেয়ে ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে কোন অসুবিধে হলো না তার। দৃষ্টি সরল, নত হলো মাথা, হাঁটার মধ্যে জড়তা থাকলেও পাশ কাটিয়ে চলে আসতে পারল সে। তবু, পাশ কাটিয়ে আসার পর, পিছন ফিরে তাকাবার প্রবল একটা ঝোঁক চাপল। নিজেকে দমন করল শিরিন। এর নামই তো ভালবাসা, তাই না? কোন লোভ, কোন প্রলোভন তাকে কাবু করতে পারবে না। অন্য কোন পুরুষ, তা সে যতই সুন্দর হোক, তাকে দেখে যদি উন্মাদও হয়ে ওঠে, ঘাড় ফিরিয়ে দ্বিতীয়বার তাকাবে না সে। ভালবাসার পবিত্রতা তো এখানেই, নয় কি? শিরিন ভাবল, এখানে সত্যি সত্যি মৃদুল নেই, একবার তাকালে কেউ জানবে না, মহাভারতও অশুদ্ধ হবে না, তবু আমি তাকাব না। দেখো সবাই, দেখো, আমি তাকাচ্ছি না। তাকাচ্ছে না বলে, এই মুহূর্তে, নিজেকে নিয়ে ভারি গর্ব হচ্ছে শিরিনের। এ মৃদুলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারার গর্ব। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারার আনন্দ। কঠিন পরীক্ষা? হ্যাঁ, সত্যি অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা। সে সাধারণ কোন পুরুষের সামনে পড়ে যায়নি। চেনে না, আবার চেনেও। কারণ কুমারী যে-কোন মেয়ে ঠিক এরকম একটা ছেলের স্বপ্নই দেখে থাকে। সেই মেয়ের রাত এবং দিন কাটে মনে মনে ঠিক এই ছেলেরই ছবি এঁকে। সারাজীবন ধরে অনেক সাধনা করলেও কল্পজগতের এই পুরুষ বাস্তবে রূপ নিয়ে কারও সামনে খুব কমই আসে। তার জীবনে এল। কিন্তু এল অনেক দেরি করে। আগেই তো সে

মৃদুলকে মন দিয়ে বসে আছে।

এই মুহূর্তে তাকাতে না পারায় গর্ব ও আনন্দ হলো ঠিকই, কিন্তু মনের গভীরে একটা শোক বা হাকাকারও জাগল। কষ্টটা এখুনি টের পাচ্ছে না বটে, তবে সেটা মূল্যবান কিছু হারানোর বেদনা হয়ে বেশ কিছুদিন ভোগাবে তাকে। এক সময় মনে হবে, নিজেকে সে বঞ্চিত করেছে।

ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে থেমে থেমে আলোচনা চলল সেই দুপুর পর্যন্ত। কার্লা সৈকতে নেমে যাবার পর তিন মেয়েকে নিয়ে নাস্তা খেতে বসলেন আলি হায়দার। সবাই ধরে নিয়েছিল শিরিন গম্ভীর হয়ে থাকবে। কিন্তু ঘটল উল্টোটা, তাকে খুব সপ্রতিভ ও হাসিখুশি দেখাল। টেবিলে বসে প্রথমেই সে আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, 'এক ভদ্রলোককে দেখলাম। কেন এসেছিলেন?'

হাত ঝাপটালেন আলি হায়দার, যেন প্রসঙ্গটার কোন গুরুত্ব নেই। 'একটা পাগল। বলে কিনা আমরা যদি তিনকন্যা বেচি, এখানে সে বিশাল এক বেসরকারী পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবে। আর যদি না বেচি, সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসাটা করতে চায়। তিনকন্যা দেব আমরা, সে দেবে সমস্ত পুঁজি। বছরে নাকি কয়েক কোটি টাকা আয় হবে।' হাসছেন তিনি।

'আপনি কি বললেন?' জানতে চাইল শিরিন।

'বললাম নিজের চরকায় তেল দাও, এদিকে যেন তোমাকে আর না দেখি।'

একটু থতমত খেয়ে গেল শিরিন। জবাব শুনে নিশ্চয়ই অপমানবোধ করেছেন ভদ্রলোক। 'কি করেন তিনি?'

'বলল তো জাপানে ব্যবসা করে। আমি নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। বাদ দাও ওর কথা, এসো নিজেদের সমস্যা নিয়ে কথা বলি।'

শিরিন ও তারিনের মনে সম্ভাব্য যে-সব প্রশ্ন জাগতে পারে সেগুলো তিনি নিজেই উচ্চারণ করলেন, এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাবও ব্যাখ্যা করলেন। কার্লা মদ খায়, সেটা তাকে ছাড়তে বলা যাবে কিনা? না, তা বলা যাবে না, কারণ খ্রিস্টানদের জন্যে মদ খাওয়া বারণ নয়—যীশু নিজেও খেতেন। ওদের দেশে শীত প্রচণ্ড বলে মদ খাওয়াটা প্রয়োজনও। কার্লার আরও অনেক আচরণ ওদের খারাপ লাগতে পারে, যেমন সবার সামনে স্বামীকে আদর করা বা খোলামেলা পোশাক পরা। না, এ-সব ব্যাপারেও তাকে কিছু বলা যাবে না। কারণ সে এমন একটা সমাজে বড় হয়েছে যেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। সেখানে যেমন খুশি তেমনি ভাবে জীবনযাপন করা যায়, কারও কোন ক্ষতি না করলেই হলো। প্রত্যেকেরই নিজস্ব লাইফস্টাইল থাকতে পারে, তাতে কারও হস্তক্ষেপ করা চলে না, সেটা তোমার পছন্দ না হলেও। মানুষের স্বাধীনতার মাত্রা ক্রমশ বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে ওরা যেখানে ধর্ম, শালীনতা বোধ, নীতি, বিবেক ইত্যাদির সংজ্ঞা আশ্চর্য রকম বদলে গেছে, বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে ওগুলোর হয়তো আর কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু তা সত্যি নয়। ওদের মধ্যে অকারণ জড়তা নেই, সেটাকে শালীনতা বিসর্জন দেয়া হয়েছে মনে করা ঠিক নয়। তবে এ-কথাও ঠিক যে ওদের সমাজে যা চলে আমাদের সমাজে তা চলবে না। কার্লার আচরণ পছন্দ করতে না পারলে মেয়েদেরকে তিনি দোষ দিতে পারেন না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলার আছে তাঁর। তা হলো, ওরা যদি লণ্ডনে গিয়ে নিজেদের রুচি অনুসারে জীবনযাপন করে, কার্লা তাতে ভুলেও কোনদিন বাধা দেবে না বা সমালোচনা করবে না।

শিরিন ভাবল, এরপর আব্বু জিজ্ঞেস করবেন, কেন তারা দুই বোন ইংল্যাণ্ডে যেতে রাজি নয়। কিন্তু না, সে প্রশ্ন তিনি তুললেন না। আরও এক ঘণ্টা পর মেয়েদেরকে নিয়ে শ্বেতবসানার ছাদে উঠে এলেন তিনি,

ব্যাখ্যা করলেন নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতি। প্রথমেই জানালেন, কার্লার নিজের যে সয়-সম্পত্তি আছে তার মূল্য কয়েক কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ স্বামীর ধন-সম্পদ তার না পেলেও চলবে।

তারপর দুপুরে খেতে বসে তিনি বললেন, শিরিন আর তারিন যদি দেশে থাকতে চায়, সেটাও একদিক থেকে ভাল। এ-দেশের অনেক কিছুই ব্যক্তিগতভাবে তিনি পছন্দ করেন না, তবু দেশের প্রতি মায়া ভালবাসা নেই বললে তাঁর ওপর অন্যায় করা হবে। কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ও ব্যাখ্যা করে শোনালেন। তিনকন্যার বাড়ি ও জমি ওদের মায়ের নামে কেনা হয়েছিল, তা এখন তিনি ওদের দুই বোনের নামে করে দিয়ে যাবেন। কক্সবাজার আর চট্টগ্রামের বাড়ি তাঁর নামে আছে, তাই থাকবে। বাড়ি দুটো থেকে বাইশ হাজার টাকা ভাড়া ওঠে, ওই টাকাতেই লেখাপড়া ও খাওয়া-পরার খরচ চালিয়ে নিতে হবে ওদেরকে। বড় ধরনের অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোন বিপদে মোটা টাকার প্রয়োজন হলে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অবশ্য প্রতি বছরই অন্তত একবার দেশে এসে ওদের দু'বোনকে দেখে যাবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে একটু আভাস দিলেন, কার্লা চায় না তাকে একা রেখে দু'একদিনের বেশি কোথাও থাকেন তিনি। তবু, জোর দিয়ে বললেন, বছরে অন্তত একবার আসবেনই। কার্লা না ছাড়লে তাকেও সঙ্গে করে আনবেন।

আব্বু নিজেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেললেন দেখে মনে মনে ভারি স্বস্তিবোধ করল শিরিন। বিকেলের দিকে বিদায়ের সময় কার্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে এতটুকু তার বাধল না। মহিলার সঙ্গে ওরা দুই বোন ভাল ব্যবহার করেনি, সে-কথা ভেবে নিজেকে তার অপরাধী মনে হলো। কার্লা ওদেরকে আলিঙ্গন করল, চুমো খেলো, তারপর দামী এক রাশ উপহার দিয়ে রাজহংসে গিয়ে উঠল। আদিবাসিদের দুই পরিবার ও বাঙ্গালী তিন পরিবারের সবাইকে আগেই ডাকা হয়েছিল, আলি হায়দার

সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার দুই মেয়েকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও ওদেরকে তোমরা রক্ষা করবে।'

আগেই ঠিক হয়েছে, তিন মাস পরে দেশে ফিরে আসবেন আলি হায়দার। দলিল, দানপত্র ইত্যাদি তখন সব চূড়ান্ত করা হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না শিরিন, আব্বুকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। তারিন এ-ধরনের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয়ার মেয়ে নয়, সে খুব জরুরী তাগাদা দেয়ার সুরে আইরিনকে বোঝাচ্ছে লণ্ডন থেকে কি কি তাকে কিনে পাঠাতে হবে।

কার্লাকে নিয়ে আলি হায়দার চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা দুই বোন। হঠাৎ তারিন দেখল, ওদের ট্রলারটা ফিরে আসছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শিরিনও লক্ষ করল ব্যাপারটা। 'কে চালাচ্ছে, চোছিন না। কোথায় গিয়েছিল ও?'

তারিন বলল, 'কেন, তুই জানিস না? হ্যাঁ, চোছিন। তারিক হাসানকে কক্সবাজারে পৌঁছে দিয়ে এল।'

'তারিক হাসান? সে আবার কে?' শিরিন বিস্মিত।

'সে এক জাদুকর। তার কাছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে। বশংবদ দৈত্যকে দিয়ে এক নিমেষে তিনকন্যাকে আধুনিক শহর বানিয়ে ফেলবে। এই শিরিন, না জানার ভান করছিস কেন রে? নিশ্চয়ই তাকে দেখেছিস তুই, কথাও বলেছিস। তা না হলে আব্বুকে ওভাবে জেরা করছিলি কেন? ভেবেছিস আমি খেয়াল করিনি? সাংঘাতিক স্মার্ট, তাই না? আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, তুই চোখ ফেরাতে পারিসনি। আমি এত কঠিন মেয়ে, আমারই মাথা ঘুরে গেছে···।'

'কি যা তা বকছিস!' ধমক দিল শিরিন।

'আব্বুকে জিজ্ঞেস করে কিছুই তো জানতে পারিসনি,' বলল

তারিন। 'আমাকে জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানতে পারতি। ঠিক আছে, তোর যখন আগ্রহ নেই, থাক।'

শিরিন বলল, 'সে যে-ই হোক, স্পর্ধা তো কম নয়। ভেবে পাই না তিনকন্যা কিনতে চাওয়ার সাহস পেল কোত্থেকে!'

'বলে গেছে আবার আসবে।' ভুরু নাচিয়ে হাসছে তারিন। 'এলে নিজেই জিজ্ঞেস করিস। শুধু তিনকন্যা নয়, দেখার পর আমাদেরকেও না কিনতে চায়।'

'তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না?' রেগে যাচ্ছে শিরিন।

'না, একটু ভুল হলো। তুই তো আগেই মৃদুল ভাইয়ের কাছে বিক্রি হয়ে গেছিস। তারিক হাসান কিনতে চাইলে আমাকে কিনতে চাইবে। বাধা হয়ে দাঁড়াবি না তো? এখন থেকে তুইই আমার গুরুজন, ছাড়পত্রটা এখুনি নিয়ে রাখি।'

'এইমাত্র আব্বু আর আইরিন চলে গেল, তোর হাসি-ঠাট্টা করতে ভাল লাগছে?' বলে জেটি থেকে নেমে পড়ল শিরিন। বাড়িতে ফিরে চিঠি লিখতে বসবে সে। আব্বুর সিদ্ধান্তের কথা মৃদুলকে জানানো দরকার।

দুই

দেখতে দেখতে তিন বছর পার হয়ে গেল। প্রতি বছর মেয়েদেরকে দেখে যাবেন বললেও আড়াই বছর হতে চলল আলি হায়দার দেশে ফিরছেন না। তারিন আর শিরিনকে তিনি যে ভুলে গেছেন, ব্যাপারটা

তা নয়। ইতিমধ্যে দু'বার হার্ট অপারেশন হয়ে গেছে তাঁর, শেষবার পাঁজর কেটে বুক খুলতে হয়েছিল; ডাক্তাররা দীর্ঘভ্রমণ নিষেধ করেছেন। নিজে আসতে পারছেন না বলে মেয়েদেরকে তিনি চিঠিতে ডাকছেন, একবার অন্তত তাঁকে দেখে যাক ওরা। তারিনের খুব উৎসাহ, অনেক বলে-কয়ে শিরিনকে রাজিও করিয়েছে সে। তবে একটা শর্ত দিয়েছে শিরিন, আগে ওদের বিয়েটা হয়ে যাক, সঙ্গে মৃদুলকেও নিয়ে যাবে।

এক বছর হলো চাকরি করছে মৃদুল। কমার্স নিয়ে পাস করেছে ও, রেজাল্টও খুব ভাল, নাম করা একটা ব্যাংক ওকে লুফে নিয়েছে। চলতি মাসে যে-কোন দিন শিরিনেরও রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে, সে-ও এখন থেকে চাকরির চেষ্টা করছে। পরীক্ষার পর হোস্টেল ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, তবে তিনকন্যায় ফিরে না গিয়ে চট্টগ্রামে নিজেদের বাড়িতে উঠেছে সে, উদ্দেশ্য মৃদুলের কাছাকাছি থাকা এবং সেই সঙ্গে ঘন ঘন বিয়ের তাগাদা দেয়া।

বিয়ের ব্যাপারে মৃদুলের দ্বিধা আছে। কারণটাও শিরিন জানে। অভিভাবকরা তাসমিনার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মৃদুলের বিয়ে দিতে রাজি নন। শিরিনের যুক্তি হলো, তাসমিনা আপার জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে দশ বছর ধরে, পাওয়া যায়নি। আরও দশ বছরের মধ্যে যে পাওয়া যাবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। মেয়ে দেখতে খারাপ হলে, লেখাপড়া না শিখলে, প্রচুর যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে এ সমাজে বিয়ে দিতে সমস্যা হবেই। এমনকি সে মেয়ের বিয়ে কোনদিন না-ও হতে পারে, বিশেষ করে যদি মেয়ের অভিভাবকরা একটু বেশি বাছবিচার করেন। এরকম পরিস্থিতিতে শিরিন ও মৃদুল আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারবে? একজনের জন্যে কি আরেকজনকে ঠেকিয়ে রাখাটা উচিত?

মুশকিল হলো, যতই তাগাদা দিক শিরিন, মৃদুল চুপ করে থাকে। ও যে বদলে গেছে, তা-ও নয়, শিরিন বুঝতে পারে আগের মতই তাকে

ভালবাসে মৃদুল। শুধু একটা ব্যাপারে তার দুর্বলতা, বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে পারবে না। তারা অনুমতি না দিলে শিরিনকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শিরিন বুঝতে পারে মাথার ওপর যেহেতু কোন অভিভাবক নেই, যা করার তাকেই করতে হবে। একটা মেয়ের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবটুকু করে দেখছে সে। একদিন শুনল তাসমিনা আপাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে কুয়েত ফেরত এক ছেলে, কিন্তু যৌতুক হিসেবে তিন লাখ টাকা চেয়ে বসেছে সে। মৃদুল জানাল, ওর আব্বুর কাছে অত টাকা নেই, কাজেই এ বিয়ে হবে না। শিরিন কোন দ্বিধা করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ধার হিসেবে টাকাটা মৃদুলকে দিতে চাইল সে। গত তিন বছরে প্রায় ওই তিন লাখ টাকাই জমিয়েছে ওরা দুই বোন। টাকাটা ধীরে ধীরে কয়েক বছরের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেই হবে। দান হিসেবে দিতে চাইলে মৃদুল নিতে চাইবে না, সেজন্যেই কথাটা বলা হলো। ফিরিয়ে নেয়ার কোন ইচ্ছে তার আসলে নেই।

প্রস্তাব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মৃদুল, কোন কথা বলল না। প্রতিদিনই প্রসঙ্গটা তুলতে থাকল শিরিন। দিন পনেরো পর একদিন মৃদুল জবাব দিল। যৌতুকের বিনিময়ে মেয়েকে পার করতে রাজি নন ওর আব্বু। যে ছেলে যৌতুকের লোভে বিয়ে করবে, বিয়ের পরও সে মেয়েকে চাপ দেবে বাপের বাড়ি থেকে আরও টাকা আনার জন্যে। তিনি জামাই চান, রাক্ষস না। কথাগুলোয় যুক্তি থাকলেও, রেগে গেল শিরিন। বলল, এত কথা ভাবলে তোমার বোনের কোনদিনই বিয়ে হবে না।

তারপর একদিন চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে বসে বলল, 'মৃদুল, এভাবে কতদিন অপেক্ষা করব আমরা?'

মৃদুল খাওয়া বন্ধ করল না। কোন জবাবও দিল না।

'চুপ করে থাকাটা সমাধান নয়, মৃদুল।' নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখছে শিরিন। 'একটা কিছু করতে হবে আমাদের।'

'কি করব বলে দাও তুমি।'

'ঠিক আছে, চলো গোপনে বিয়ে করে ফেলি,' বলল শিরিন। দু'বোন আমরা এখন একটা ঘরে আছি, বিয়ের আগে এক ফ্ল্যাটের ভাড়াটেকে তুলে দেব। দিনের বেলা ওখানে আসবে তুমি। তারিন ছাড়া কেউ জানবে না আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ শুধু নিজেদেরকে কাছে পাওয়ার জন্যে বিয়েটা এখুনি হওয়া দরকার?'

'বিয়ের উদ্দেশ্যই তো তাই। তুমি আমাকে কাছে পেতে চাও না?'

হেসে ফেলল মৃদুল। 'চাই না মানে? নিজেই তো জানো, একটা চুমো খাবার জন্যে কি রকম পাগল হয়ে থাকি। একদিনও তো সুযোগ পেলাম না।'

মৃদুলের হাতে হাত রাখল শিরিন। 'ভেবেছ তোমার কষ্ট আমি বুঝি না?'

কিন্তু মাথা নাড়ল মৃদুল। 'শিরিন, আব্বু-আম্মু অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কিভাবে বেঈমানী করি, বলো?'

রাগ চেপে শিরিন জানতে চাইল, 'তাহলে তোমার কাছ থেকে কি আশা করব বলে দাও।'

'এতদিন যখন অপেক্ষা করেছ, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো, প্লীজ।'

'কিছুদিন মানে কতদিন, মৃদুল?' হতাশা চেপে রাখতে না পারায় শিরিনের বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

'কি করে বলি কতদিন।' অসহায় দেখাল মৃদুলকে। 'হয়তো ছ'মাস, হয়তো এক বছর।'

'কিংবা হয়তো সারাজীবন, তাই না?'

মৃদুল কথা বলল না। তার হাত ও মুখ আগের মতই চলছে।

'তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে? কথা বলার সময় খাওয়াটা বন্ধ করলে হয় না?'

হাত ও মুখ স্থির হয়ে গেল মৃদুলের। 'তুমি আমাকে খোটা দিলে? আমি কি খুব বেশি খাচ্ছি?'

সাবধান হয়ে গেল শিরিন। কথাটা তার এভাবে বলা উচিত হয়নি। 'সত্যি দুঃখিত, মাফ করে দাও। আমি সেজন্যে বলিনি। তুমি আমার কথা ভাল করে শুনছ না ভেবে রাগ হয়ে গিয়েছিল। কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি।'

মৃদুল খাওয়া বন্ধ করে টিস্যু পেপারে হাত মুছল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'হাত মুছলে কেন? খাও!'

'না। বিলটা তুমি দিচ্ছ বলে কথাটা শুনতে হলো আমাকে।'

'ছি-ছি, কি বলছ!' অস্থির হয়ে উঠল শিরিন। 'খোদার কসম বলছি, কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। অন্যায় হয়েছে, মাফ চাই···।'

'আমি বাইরে অপেক্ষা করছি,' বলে চেয়ার ছাড়ল মৃদুল, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

মৃদুল এভাবে ভুল বোঝায় কান্না পেল তার। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রেখে বেয়ারাকে ডেকে বিল চাইল। বাইরে এসে দেখে সিগারেট ধরাচ্ছে মৃদুল, ওর হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। এ বিষয়ে দু'জনের কেউই আর কিছু বলেনি। ওখান থেকে ওরা পার্কেও গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন আর সহজ হতে পারেনি কেউ।

শিরিন ভেবেছিল অকারণে রাগ করে নিজেই অনুতপ্ত হবে মৃদুল। অন্তত ঘটনাটার কথা ভুলে যাবে ও। কিন্তু না, শিরিনের সেদিনের সামান্য একটা কথা সিরিয়াসলি নেয় ও, পরে ভুলেও যায়নি। এরপর থেকে কোথাও কিছু খেতে গেলে আগেই জানিয়ে দেয় শিরিনকে, বিলটা ও-ই দেবে। মন খারাপ হয়ে গেছে শিরিনের, তবে কোন প্রতিবাদ করেনি। অন্যায় যদি করেও থাকে সে, সঙ্গে সঙ্গে মাফও তো

চেয়ে নিয়েছে, তাই না? তারপরও মৃদুল যদি ভুলতে না পারে, কি আর করতে পারে সে। তবে খারাপ লাগাটা বাড়তেই লাগল। হপ্তায় অন্তত দু'দিন চাইনিজ খাওয়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন দেখা হলেও আইসক্রীম বা সুপ, কিছু না কিছু খায় ওরা। এখনও খাচ্ছে, তবে বিলটা শিরিন দিতে পারছে না। অথচ সে খুব ভাল করেই জানে, মৃদুলের আব্বু অবসর নেয়ার পর ওর টাকাতেই ওদের সংসার চলে।

এই ঘটনার পর আরও একটা সমস্যায় পড়ল শিরিন। প্রতি মাসে, কোন উপলক্ষ থাক বা না থাক, মৃদুলকে কিছু না কিছু প্রেজেন্ট করে সে। সব সময় যে সেগুলো দামী জিনিস হয়, তা না। পছন্দ হলে একটা টাই বা একটা কলম। কিন্তু ওর অভিমানের বহর দেখে তার সন্দেহ হলো, এখন কিছু প্রেজেন্ট করলে হয়তো ফিরিয়ে দেবে। এত ভয় পেল, বেশ কিছুদিন কিছু কিনলই না।

তারপর এসে গেল তার জন্মদিন। গত দু'বছর তারিখটা মৃদুলই মনে করিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কেকটাও কিনেছে ও, খুঁজে-পেতে চমকে দেয়ার মত উপহার যোগাড় করেছে। এবার জন্মদিন প্রসঙ্গে কিছুই বলল না শিরিনকে। মনে মনে অভিমান হলেও, শিরিনও চুপচাপ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। দেখাই যাক না কি করে মৃদুল।

আগের দিন তারিন তাগাদা দিলেও বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো না। শিরিন বলল, 'একটা বছর জন্মদিন পালন না করে দেখি না কেমন লাগে।'

তারিন বলল, 'বুঝেছি, মৃদুল ভাইয়ের সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে তোর।'

বাড়িটা নিজেদের হলেও, ছ'তলার মাথায় বড়সড় একটা মাত্র ঘরে ওরা দুই বোন থাকে। সিঙ্গেল দুটো খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রোব, একটা মিনি রেফ্রিজারেটর ফেলার পর যেটুকু জায়গা খালি থাকে তা দখল করে নিয়েছে বেতের দুটো চেয়ার। তবে ছাদটা রেলিং দিয়ে

ঘেরা, আকারেও সেটা বিশাল। রোদ না থাকলে খোলা ছাদে হাঁটাহাঁটি করে ওরা, অনেক দূর পর্যন্ত শহর দেখে। আজ শেষ বিকেলে অবশ্য নিজের খাটে উপুড় হয়ে উপন্যাসে নাক ডুবিয়ে রেখেছে তারিন, হাঁটাহাঁটি করছে একা শিরিন।

এই মুহূর্তে খুব অস্থির দেখাচ্ছে ওকে। আশা নিরাশার দোলায় দুলছে মনটা। একবার ভাবছে, না, মৃদুল আসবে না। আজ যে তার জন্মদিন, ও তা ভুলে গেছে। পরক্ষণে ভাবছে, অসম্ভব, কি করে ভোলে, অবশ্যই আসবে। আর আসবে বলে মনে হলেই চট করে ঘরের ভেতর তাকাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে তারিনের ওপর। তারা দু'বোনই যথেষ্ট লম্বা-চওড়া ও স্বাস্থ্যবতী। রোগাপাতলা মেয়েদের তুলনায় তাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব সহজে মানুষের নজর কাড়ে। সেজন্যেই অতিরিক্ত সতর্ক-সাবধান হবার প্রয়োজন হয়। শিরিন প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকে। কিন্তু তারিন এ-সব একদমই গ্রাহ্য করে না। এই যেমন এখন, ওর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা রীতিমত বিপজ্জনক লাগছে শিরিনের চোখে। বিশেষ করে তারিন যখন জানে যে মৃদুল হঠাৎ করে চলে আসতে পারে, তার লক্ষ রাখা উচিত নয় কামিজের নিচের অংশ কোমরের ওপর উঠে গেল কিনা? আসলে এভাবে শুয়ে থাকাটাই তো দৃষ্টিকটু। ইচ্ছে করে এই ভঙ্গিটা নিয়ে আছে, তা হয়তো সত্যি নয়, তবে শিরিন জানে যে পুরুষদের আকৃষ্ট করার একটা প্রবণতা তারিনের আছে। বোনের সামনে ওড়না না ব্যবহার করলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মৃদুলের সামনে অবশ্যই তার ওড়না পরা উচিত। কিন্তু সে কথা তাকে কে বলবে। অনেক আগে দু'একবার বলতে গিয়ে তিক্ত কথা শুনতে হয়েছে শিরিনকে। তারিন হেসে উঠে বলেছে, 'মৃদুল ভাইকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার কোনোই ইচ্ছে নেই আমার। ওরকম অনেক মৃদুলকে চিনি আমি, বললে কাদায় শুয়ে পড়বে, আমার পা যাতে নোংরা না হয়।'

কথা শুনে মনে হবে তারিনের কাছে মৃদুলের কোন গুরুত্ব নেই।

মৃদুলের খুঁত বের করতে ভারি পটু সে। অথচ যার সঙ্গে মৃদুলের প্রেম, সেই শিরিন যেখানে গায়ে গা না লাগার ব্যাপারে সারাক্ষণ সতর্ক থাকে, সেখানে তারিন মৃদুলের কাঁধে হাত রেখে কথা বলে, চিমটি কাটে, কনুই দিয়ে গুঁতো মারে পাঁজরে।

মৃদুল প্রায়ই বলে, 'তোমাকে নিয়ে আমার কোন উদ্বেগ নেই। ভয় পাই তারিনকে। ওর বিয়েটাই আগে হওয়া উচিত বলে মনে করি।'

'কেন?'

'খেয়াল করো না, ও কেমন ছটফটে? ভয় হয় কার সঙ্গে না কি করে বসে।'

শিরিন বলেছে, 'ওকে তুমি চেনো না। ওর অনেক বাছবিচার, চাইলেই কেউ ওকে পাবে না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। তারিন এখনও একদম ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। আমার ভয় পাবার সেটাই কারণ।'

মুখে উচ্চারণ করেনি শিরিন, তবে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভয়টা মৃদুলের নিজেকে নিয়ে নয় তো? সেই থেকে সে যতটা সম্ভব সাবধান থাকতে চেষ্টা করে, খেয়াল রাখে তারিন আর মৃদুল যাতে একা হবার সুযোগ না পায়। তারিন যতই বিরক্ত হোক, মৃদুলের সামনে দৃষ্টিকটু হতেও বাধা দেয়।

কিন্তু আজ আর বাধা দেয়ার সময় পাওয়া গেল না। বোধহয় তাকে চমকে দেয়ার জন্যেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে মৃদুল। ওর এক হাতে বাক্সে বন্দী কেক, অপর হাতে মাঝারি একটা প্যাকেট ও ফুল। পায়চারি থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল শিরিন। তারিনের কথা ভুলে গেছে সে। ভুলে গেছে সমস্ত অভিমান আর মনোবেদনার কথা। দু'জনেই হাসি হাসি মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

শিরিন আর মৃদুল নয়, প্রথম কথা বলল তারিন। 'হোয়াট আ গ্রেট সারপ্রাইজ!'

ঘরের ভেতর তাকিয়ে শিরিন দেখল, খাটের ওপর সিধে হয়ে বসেছে তারিন, বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গায়ে ওড়না জড়াচ্ছে। তারপর ছাদে বেরিয়ে এল ও।

'শুনুন, মৃদুল ভাই, আজ যদি এই সারপ্রাইজটা শিরিনকে আপনি না দিতেন, চিরকাল মনে রাখার মত শাস্তি দিতাম, বুঝলেন? ভালবাসবেন অথচ জন্মদিনের তারিখ মনে রাখবেন না, এটা মেনে নিতে একদমই প্রস্তুত নই আমি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আপনার পরীক্ষা ছিল। বোনটিকে আমি ভালবাসি, বুঝলেন! এখন থেকে আপনাকেও। আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেছে। ভালবাসার ছাত্র হিসেবে আপনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা হাত ধরে ফিসফাস করুন, আমি আপনাদের জন্যে চা বানিয়ে আনি।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে।

'এসো,' বলে মৃদুলকে ঘরে নিয়ে এল শিরিন, ওর হাত থেকে ফুল, ব্যাক্স আর প্যাকেট নিয়ে বসতে দিল গদী মোড়া চেয়ারে। 'একটু সন্দেহ ছিল, তুমি ভুলেই গেলে কিনা।' কথাগুলো মৃদুলকে বলছে সে, যদিও ভাবছে তারিনের কথা। আজ যেন নতুন করে উপলব্ধি করল সে, তারিন সত্যি তাকে ভালবাসে। অথচ, ছি, ওকে সন্দেহ করে সে! নিজেকে ধিক্কার দিল, মনটা আমার এত ছোট কেন? মৃদুলকে তারিন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, এই নোংরা চিন্তা কেন আসে আমার মাথায়? মনটাই যদি সুন্দর রাখতে না পারি, নিজের কাছে তাহলে আমার দাম রইল কি!

মৃদুল হাসছে না। 'ভুলিনি, শিরিন। তবে তোমার সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক। গত দু'মাসে আমার আচরণই সেজন্যে দায়ী। তোমার ওপর সত্যি খুব অন্যায় করা হয়ে গেছে, শিরিন, সেজন্যে আমি···।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শিরিন। 'কি বলছ তুমি এ-সব!'

'বাধা দিয়ো না,' বলল মৃদুল। 'ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে

দাও। আমি জানি, শোনার পর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে।'

'ছি-ছি, মৃদুল। কখন কি অন্যায় করলে যে ক্ষমা চাইছ?'

'এটা একটা সাইকোলজিক্যাল সমস্যা, শিরিন। চাইনিজ খেতে বসে তোমার যে কথাটায় আমার প্রতিক্রিয়া হয়, সেটার কথা বলছি। অভাব-অনটন কি জিনিস, তুমি বোধহয় বুঝবে না। গ্রামের পুকুর পাড় থেকে শাক তুলে আনতেন মা, তাই দিয়ে আমরা দুপুরে ভাত খেতাম। এমনও দেখেছি, সেই শাক আমাদের ভাগে কম পড়ে যাবে ভেবে আব্বু-আম্মু আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন না, পরে শুধু লবণ দিয়ে শুকনো ভাত খেতেন। আম্মাকে কাঁদতে দেখতাম, খেতে চাইলে মারধর করতেন। বলতেন, আর কত খাবি। অথচ সারাদিনই হয়তো পেটে কিছু পড়েনি। তোরা আমাকে খা, বলে দেয়ালে মাথা ঠুকতেও দেখেছি। তাই সেদিন তুমি···।'

কাছে এসে মৃদুলের মুখে হাতচাপা দিল শিরিন। তার চোখ দুটো ছলছল করছে। হাতটা সরিয়ে দিয়ে মৃদুল বলল, 'আমি জানি, সত্যি তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করোনি বা খোটাও দাওনি। কিন্তু ছোটবেলার সেই অভাব এখনও দগদগে ঘা হয়ে আছে আমার মনের ভেতরে। তাতে খোঁচা লাগলে উদ্ভট অযৌক্তিক আচরণ শুরু করে দিই। তবে লেখাপড়া শিখেছি তো, পরে হলেও নিজের ভুলটা বুঝতে পারি। আজ তোমাকে আমি আমার এই দুর্বল দিকটার কথা খুলেই বললাম। তুমি ধনী পরিবারের মেয়ে, এটা নিয়ে আমার ভেতর একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। বুঝি, কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারি না সহজে। তাই আশা করব, আবার যদি কখনও খারাপ আচরণ করি, একটু ধৈর্য ধোরো, অন্তত ভুল শুধরে নেয়ার সময়টুকু দিয়ো আমাকে।'

একা শুধু শিরিন নয়, এবার মৃদুলের চোখেও পানি বেরিয়ে এল। তবে সে পানি ঝরে পড়তে দিল না শিরিন। আজই প্রথম মৃদুলকে চুমো খেলো সে। চুমো খেলো মানে কি, মৃদুলের চোখের জল তার ঠোঁট

জোড়া শুষে নিল।

তিন

প্রথম থেকেই ওদের প্রেম খুব শান্ত ও মধুর। কাছাকাছি থাকতে পারলেই হলো, তাতেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি, আর কিছু না পেলেও যেন চলে। মাঝে মধ্যে একটু বিশেষ সুবিধে পেতে চায় বটে মৃদুল, কিন্তু কঠিন শিরিনের কাছ থেকে তা আদায় করতে না পারলে রাগ করে না। শিরিনকে খুশি করার সব রকম চেষ্টাই ওঁর মধ্যে দেখা যাবে। প্রতি হপ্তায় নতুন কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে, হাতে ফুল না নিয়ে দেখা করবে না, এটা-সেটা প্রেজেন্ট করবে, খোঁজ নেবে শিরিন পছন্দ করে এমন খাবার কোন রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে শিরিনের জানা হয়ে গেছে ওদের শান্ত ও মধুর ভালবাসায় ছন্দপতন ঘটে শুধু বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে আর সে যদি কোনদিন মৃদুলদের বাড়িতে যেতে চায়। আজ পর্যন্ত নিজ উৎসাহে একদিনও নিজেদের বাড়িতে শিরিনকে নিয়ে যায়নি মৃদুল। মৃদুল নিয়ে যায় না, আবার একা যেতে লজ্জা লাগে, তাই প্রথম দিন তারিনকে নিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর অবশ্য একাই গেছে, এবং বহুদিন গেছে। কিন্তু গেলে কি হবে, মৃদুল খুশি হয়েছে বলে মনে হয় না। সে গেলে ওর চুপচাপ থাকার স্বভাবটা যেন মাত্রা ছাড়ায়। এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পায়নি শিরিন। আর শুধু মৃদুল একা নয়, ওদের বাড়ির প্রত্যেকে অদ্ভুত আচরণ করে তার সঙ্গে। খাতির-যত্ন করে না, তা নয়। কিন্তু চা-নাস্তা দিয়েই

চলে যায়, কথা বলার জন্যে কাছে-পিঠে কাউকে পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে শিরিন জানতে পারে, সে গেলে বাড়ির সবাই একটা ঘরে আশ্রয় নেয়, যেন পালিয়ে থাকে। কারণটা যে কি, আজ পর্যন্ত শিরিন আবিষ্কার করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে মৃদুলকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছে, 'তোমার বাড়ির সবাই আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে কেন? ওরা কি আমাকে পছন্দ করে না?'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে মৃদুল খুব জোর দিয়ে জানিয়েছে, 'আরে না! আব্বু-আম্মু, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই তোমাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। তোমার প্রশংসা ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কিছু ওদের মুখে শুনিনি।'

'তাহলে আমাকে দেখলে সবাই পালায় কেন?'

ম্লান হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে মৃদুল। 'ধনী পরিবারের মেয়ে, হয়তো ভয় পায়।'

'আচ্ছা, আমার আচরণে কি প্রকাশ পায় যে বড়লোকের মেয়ে? সত্যি কথা বলবে।'

'না।'

'সে-কথা তাহলে ওদেরকে তুমি বোঝাও না কেন? কেন বলো না, আমার বাপের টাকা থাকলেও আমি খুব সাধারণ জীবন পছন্দ করি?'

'বলি তো। এ-ও বলেছি যে তুমি তোমার আব্বুর সম্পত্তি নিতে চাও না।'

'তাহলে আমাকে ভয় পাবার কি কারণ?'

'তুমি তো প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছ। একদিন নিজেই জিজ্ঞেস করো না।'

তা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। বরং মৃদুলদের বাড়িতে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে শিরিন। তাতে করে যে মৃদুল স্বস্তিবোধ করে এবং খুশি, সেটা বেশ বুঝতে পারে সে। তার জানা হয়ে গেছে, বিয়ের কথা তোলা যাবে না, বাড়িতে যাওয়া যাবে না। এই দুটোই অশান্তির উৎস।

তারপর আরও একটা অশান্তির উৎস তৈরি হলো। এমনিতে যথেষ্ট হাসিখুশি থাকে মৃদুল, কোন কারণ নেই হঠাৎ কিছুদিন হলো মন খারাপ করে থাকছে। নানাভাবে প্রশ্ন করল শিরিন। কিছু ঘটেছে? ওর কি শরীর ভাল নেই? অফিসে কোন সমস্যা? মৃদুল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে শুধু মাথা নাড়ে। তাহলে তুমি মন খারাপ করে থাকো কেন? ঠোঁটের সেই স্মিত হাসি কোথায় গেল? জোর করে মুখটা হাসি হাসি করে মৃদুল, যেন শিরিনকে অভয় দেয়ার জন্যেই বলে, 'এই তো হাসছি!'

রেজাল্ট বেরুল শিরিনের। জানত ফার্স্ট ক্লাস পাবে না। পেলও না কেউ। সেকেণ্ড ক্লাস হলেও, সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেল শিরিন। রেজাল্ট পেয়েই মৃদুলকে ফোন করল অফিসে। বলল, 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। বিকেলে আসি?'

মৃদুল যেন আঁতকে উঠল। 'কোথায়? বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে। মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে।'

'বাড়িতে···বাড়িতে···,' ইতস্তত করছে মৃদুল।

অভিমান হলো শিরিনের। 'একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না কিসের সারপ্রাইজ, কেন তোমাদের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যেতে চাইছি···।'

মনে হলো শিরিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি মৃদুল, সে বলছে, 'একান্তই যদি বাড়িতে যেতে চাও, আজ নয়, কেমন? কাল এসো, কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর, আমি যখন থাকব—ঠিক আছে?'

'তোমার কি হয়েছে বলো তো?' এবার শুধু অভিমান নয়, রাগও হচ্ছে শিরিনের।

'কই, কি হবে?'

'তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন আমি যেতে চাইছি?'

'আমি জানি। তোমার রেজাল্ট বেরিয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ তুমি।'

শিরিনের গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল। 'তুমি জানো?'

'জেনেছি তোমার আগে। কয়েকজন স্যারকে বলে রেখেছিলাম···।'

'অথচ আমাকে বলোনি!'

'এবার বলো, কে কাকে সারপ্রাইজ দিল?'

পরদিন ওদের বাড়িতে গেল শিরিন। ইচ্ছে হয়েছিল পাঁচ কেজি মিষ্টি নিয়ে যায়। তবে কি না কি ভেবে বসে, নিয়ে গেল দু'কেজি, সঙ্গে কিছু ফুল। নতুন কিছুই ঘটল না। মৃদুলের আম্মা বললেন, সে ভাল রেজাল্ট করায় তিনি খুব খুশি হয়েছেন। কিন্তু বসলেন না, কাজের অজুহাত দেখিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বাকি সবাইও প্রায় এই একই আচরণ করল। শিরিন একবার ভাবল, একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে তাকে দেখলে ওরা পালায় কেন। কিন্তু উৎসাহ পেল না। মৃদুলের সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট গল্প করে ফিরে এল সে।

ছন্দপতন বা অশান্তির তৃতীয় উৎসটা যে কি, অনেক চেষ্টা করেও তা জানতে পারছে না শিরিন। কিছু একটা যে ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কি ঘটেছে বলতে রাজি নয় মৃদুল। আজকাল একদমই হাসি থাকে না ওর মুখে। সারাক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন করে তুলল শিরিনকে। তারপর আবার একদিন যেতে হলো তাকে ওদের বাড়িতে। উপলক্ষ মৃদুলের জন্মদিন।

গত বছর বা তার আগের বছর ওর জন্মদিনে শিরিনকে দাওয়াত দেয়নি মৃদুল, এবছরও দিল না। দাওয়াত না দিলেও যায় শিরিন, এবারও গেল। সে যে যাবে, মৃদুল তা জানত। ও একা নয়, ওদের বাড়ির সবাই। ওদের প্রস্তুতি দেখেই সেটা বুঝতে পারল শিরিন। এবার অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল, তাকে একা রেখে এক মুহূর্তের জন্যেও নড়লেন না মৃদুলের মা। কেক কাটার পর বরাবরের মত বাকি সবাই চলে গেলেও, মৃদুলের ঘরে শিরিনের পাশে বসে থাকলেন তিনি, নিজে পরিবেশন করে এটা-

সেটা অনেক কিছু খাওয়ালেন শিরিনকে। পুরোটা সময় কেন কে জানে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল মৃদুল। শিরিনের মনে হলো, মায়ের মত মৃদুলও তাকে ছেড়ে নড়তে চাইছে না।

মৃদুলের মন কেন সারাক্ষণ খারাপ হয়ে থাকে, সেই রহস্যের জট খুলতে যাচ্ছে, যদিও এখনও ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে না শিরিন। মৃদুলের আব্বু ছিলেন পাশের কামরায়, শিরিন তাঁর গলা পাচ্ছিল। এক সময় তাসমিনাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। সে বলল, 'এই মৃদুল, আব্বু তোকে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন বলে ডাকছেন।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি,' বলল বটে মৃদুল, কিন্তু ওঠার নাম নেই।

খানিক পর তাসমিনা এসে আবার তাগাদা দিল, 'কি বললাম, আব্বু না তোকে ডাকছে!'

এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হলো মৃদুলকে। মৃদুল কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই ওর আম্মু ফিসফিস করে শিরিনকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব বলে এতক্ষণ বসে আছি, মা। মৃদুলের সামনে বলতে পারছিলাম না।'

'কি কথা, আন্টি?'

'কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। কাল বা পরশু সকালের দিকে আসতে হবে তোমাকে। সকাল মানে, দশটা থেকে বারোটার মধ্যে এলেই হবে। মানে মৃদুল যখন থাকবে না। আমি একা না, ওর আব্বুও তোমাকে বোঝাবেন। কিন্তু মা, তোমাকে একটা কথা দিতে হবে। মৃদুলকে তুমি কিছু জানাতে পারবে না।'

কিছু বলা তো দূরের কথা, বিস্মিত হবারও সময় পেল না শিরিন। ঝড়ের বেগে ঘরে ফিরে এল মৃদুল, বারবার শিরিন আর আম্মুর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, যেন বোঝার চেষ্টা করছে ওর অনুপস্থিতিতে কি কথা বলাবলি হচ্ছিল। যেন কিছুই হয়নি, এরকম একটা নির্লিপ্ত ভাব

নিয়ে থাকতে হলো শিরিনকে। একটু পর মাথা ধরার অজুহাত তৈরি করে ফিরে এল সে।

আকাশের কোণে কাল বৈশাখীর মেঘ জমেছে, অজানা আশঙ্কায় বুকটা কাঁপছে শিরিনের। মৃদুলকে গোপন করে তাকে কি কথা বলতে চান ওর আব্বু-আম্মু? কেন এই রাখ রাখ ঢাক ঢাক ভাব? মৃদুলেরই বা এত মন খারাপের কারণ কি? সামান্য একটু আভাস পেলে মানুষের মন সবই বুঝে নিতে পারে, শিরিনও পারছে। কি কথা বলা হবে তাকে, আন্দাজ করতে পারছে সে প্রায় নির্ভুলভাবেই। সেজন্যেই আতঙ্কে কুঁকড়ে উঠছে তার সমগ্র অস্তিত্ব। এমন দিশেহারা বোধ করছে, মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পরদিন সে যেতে পারল না। ইচ্ছে হলো মৃদুলকে ফোন করে সব জানায়। ওকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে চেষ্টা করুক, আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে। তারপর ভাবল, আন্টি যখন নিষেধ করে দিয়েছেন, প্রথমে ওঁদের বক্তব্য তার শোনা উচিত। তারপর ভাবল, একা যাবে, নাকি তারিনকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? না, তারিন অত্যন্ত বদমেজাজী, অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু শুনলে মুখে যা আসবে তাই বলে বসবে, পরের বাড়ি বলে ভয় পাবে না। তাছাড়া, কেন কে জানে, ক'দিন হলো তারিনও দূরে দূরে থাকছে।

রাতে ভাল ঘুম হলো না। নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল শিরিন, এমনও তো হতে পারে, সাংঘাতিক কিছু বলবেন না ওঁরা। হয়তো তাসমিনা আপার বিয়ের জন্যে টাকা লাগবে, মৃদুলকে না জানিয়ে তার কাছ থেকে ধার চাইবেন সেটা। তা যদি হয়, শিরিন খুশি মনেই টাকা দেবে।

তবু আশঙ্কাটা দূর হলো না। দুরু দুরু বুকে মৃদুলদের বাড়ির দরজায় হাজির হলো শিরিন ঠিক দশটায়। দরজা খুলে দিলেন মৃদুলের আম্মা,

তিনি যেন ওর কড়া নাড়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন। ওকে নিয়ে সরাসরি নিজেদের বেডরুমে চলে এলেন তিনি। বাড়িটার পরিবেশ কেমন যেন অবাক করে দিচ্ছে শিরিনকে। মনে হলো, কেউ কোন শব্দ করছে না। মৃদুলের ভাই-বোনরা কি বাড়িতে নেই কেউ? ওদের পিছু পিছু মৃদুলের আব্বুও ঘরে ঢুকলেন। তিনি বা তাঁর স্ত্রী হাসছেন না। এরইমধ্যে ঘামতে শুরু করে দিয়েছে শিরিন। আন্টি ঘরের দরজায় খিল লাগাচ্ছেন দেখে তার হার্টবিট আরও বেড়ে গেল।

'বসো, মা,' গম্ভীর গলা, অথচ আদর মাখানো, শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল শিরিনের বুক। বোকার মত মৃদুলের আব্বার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি, বললেন, 'শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বলো।'

আন্টি বললেন, 'আমাকে কেন ঠেলে দিচ্ছ। তুমিই বোঝাও।'

শিরিনের দিকে তাকালেন মৃদুলের আব্বা। 'তুমি বসছ না কেন, মা? বসো। চা খাবে?'

কথা বলতে পারছে না শিরিন। শুধু মাথা নাড়ল। চেয়ার একটা আছে, তবে সেটা খানিক দূরে। খাটের কিনারাতেই বসল সে।

'তোমাকে মা খুব বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে,' শুরু করলেন মৃদুলের আব্বা। 'সেটা কি, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলে তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে। তুমি তো জানো, গত দশ-বারো বছর ধরে তাসমিনার বিয়ের জন্যে কত চেষ্টাই না করলাম আমরা। কিন্তু কেউ ওকে পছন্দ করে না। এই ক'বছরে মাত্র একটা ছেলে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তা-ও টাকা পাবার লোভে। এরকম লোভী ছেলের সংসারে গিয়ে মেয়েটা সুখী হতে পারবে না···।'

'আসল কথাটা সংক্ষেপে বলে ফেললেই তো ভাল হয়, টেনে লম্বা করার কি দরকার?' বিরক্তি প্রকাশ করলেন আন্টি।

'আসল কথাটা হলো, আমরা বুঝতে পেরেছি, এভাবে যতই চেষ্টা করা হোক, তাসমিনার বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এই সমস্যার সহজ

একটা সমাধান আছে। সেটা হলো বিনিময়।'

'বিনিময় বলে রয়ে গেলে?' আন্টির গলায় ঝাঁঝ। 'ব্যাখ্যা করে বলো।'

'বিনিময় মানে হলো, যে বাড়িতে তাসমিনাকে পাঠাব, সে বাড়ি থেকে তাসমিনার মতই দেখতে খারাপ একটা মেয়েকে এ বাড়িতে আনব আমরা। অর্থাৎ দেখতে খারাপ বলে বিয়ে হচ্ছে না, এমন একটা মেয়েকে মৃদুলের বউ করে আনব, বিনিময়ে সে বাড়ির ছেলে তাসমিনাকে বিয়ে করবে। এটাই একমাত্র সমাধান।'

আন্টি বললেন, 'শুরু যখন করেছ, সবটুকুই বলো।'

মৃদুলের আব্বা বললেন, 'তোমার আর মৃদুলের সম্পর্কটা আমরা বুঝি। এ-ও জানি যে ব্যাপারটা মেনে নিতে তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট একা শুধু তোমার নয়, মৃদুলেরও হবে,' বললেন আন্টি। 'তবে কষ্ট হলেও, মৃদুলকে নিয়ে আমরা ভয় পাচ্ছি না। কারণ জানি, আমরা যা বলব তাই করবে সে, কোন অবস্থাতেই আমাদের অবাধ্য হবে না। আঘাত পাবে, তবে এক সময় সেটা সামলে নিতেও পারবে।' স্বামীর দিকে ফিরে আবার তাগাদা দিলেন, 'সবটুকু বলো।'

'মা শিরিন,' কাতর গলায় বললেন মৃদুলের আব্বা, শিরিনের একটা হাত ধরে ফেললেন। 'জানি তোমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু এ-ও সত্যি যে কালো কুৎসিত একটা মেয়ের বাপ আমি। আমি চাই, মৃদুলের আশা তুমি ছেড়ে দেবে।'

'তুমি যখন বলবে না, বাকিটুকু আমিই বলি।' আন্টির হাবভাবে আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা লক্ষ করল শিরিন, সেটা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে। 'শোনো, মা, তোমাকে আমরা কিছুই লুকাচ্ছি না। তাসমিনা আর মৃদুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামী মাসের তিন তারিখে বিয়ে, আর এগারোদিন পর। আমরা মেয়ে দেখে এসেছি। মেয়েটা দেখতে খারাপ, তাসমিনার মত অতটা হয়তো নয়। তবে তার ভাই, যার সঙ্গে

তাসমিনার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে আমাদের মৃদুলের চেয়েও দেখতে ভাল। সে যাই হোক। তোমাকে আমাদের বলার কথা হলো, এ বিয়েতে মৃদুলকে আমরা রাজি করিয়েছি। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, শিরিন? মৃদুল তার বোনের কথা ভেবে এই ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হয়েছে।'

'এই কথাগুলো তোমাকে না বলে বলা উচিত ছিল তোমার গুরুজনদের,' বললেন মৃদুলের আব্বা। 'কিন্তু তোমার আব্বু তো দেশে থাকেনই না। তবু আমরা চেষ্টা করেছি তোমাকে যাতে সরাসরি বলতে না হয়। তোমার বোন তারিনকে ডেকে ইতিমধ্যে সব একবার বুঝিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু সে রাগ করে উঠে যায়। যাবার সময় বলে গেল, তোমাকে সে এ-সব শোনাতে পারবে না।'

কোন কিছুতেই এখন আর বিস্মিত হচ্ছে না শিরিন। সে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, তা-ও ঠিক বুঝতে পারছে না। কখন চেয়েছিল মনে করতে পারল না, তবে পানি ভরা গ্লাসটা আন্টি তার দিকে বাড়িয়ে দিতে অনুভব করল গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পানিটুকু ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল সে। তারপর ফিসফিস করে শুধু বলতে পারল, 'আমাকে একটা রিকশা ডেকে দেয়া যায়?'

চার

ট্র্যাকস্যুট পরে খোলা ছাদে জগিং করছিল-তারিন। রোজ তার ঘুমই ভাঙে দশটার পর। শিরিনের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে স্থির হলো, তবে চোখে-মুখে এতটুকু সহানুভূতি ফুটল না। 'আমি জানি,' বলল ও, 'মৃদুল

ভাইদের বাড়িতে গিয়েছিলি। ওঁরা কি বলেছেন তা-ও আমি জানি। আমি খুশি হয়েছি, উচিত শিক্ষা হয়েছে তোর।'

কথা না বলে ঘরে ঢুকল শিরিন, চেয়ারে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল। তার সামনে এসে দাঁড়াল তারিন। আজ ওকে খুব নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। 'মাঝে মধ্যে আমার সন্দেহ হয়, যমজ তো দূরের কথা, তুই কি সত্যি আমার আপন মায়ের পেটের বোন? তাই যদি হবে, তোর সঙ্গে আমার এত পার্থক্য কেন?'

শিরিন কথা বলছে না। এখনও মুখ ঢেকে রেখেছে।

'আভাসে-ইঙ্গিতে কতদিন বলতে চেয়েছি, মৃদুল ভাইকে আমার সুবিধের মনে হয় না,' থামছে না তারিন, বলেই যাচ্ছে। 'খালি মিটিমিটি হাসে, কথা বলে নরম নরম, মনের ভেতর কি চলছে কিছুই বোঝা যায় না। এতকথা বাদ দে, স্ট্যাটাস বা স্ট্যাণ্ডার্ড, কোনটাই কি মেলে? আমরা কি আর ওরা কি?'

আওয়াজ করছে না, নিঃশব্দে কাঁদছে শিরিন।

'তোকে আমার রাশি রাশি ভুলের সমষ্টি মনে হয়,' কথা তো নয়, তারিন যেন চাবুক মারছে। 'ভার্সিটির কত ছেলে তোর জন্যে পাগল, অথচ মিনমিনে এক শয়তান কাঙালকে ধরে ঝুলে পড়লি। বললাম ভুল করছিস, তবু নিজেকে সংশোধন করলি না। তারপর গো ধরেছিস, আব্বুর সয়-সম্পত্তি নিবি না। কেন? না, আম্মুকে না জানিয়ে, আমাদের জন্মের আগে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বেঈমানী করেছেন তিনি। কিন্তু আব্বু কেন এই কাজ করলেন, সেটা একবার ভেবে দেখেছিস কখনও? আব্বুরও তো একটা জীবন; তাঁরও তো সুখী হবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আম্মু তো বিয়ের আগে থেকে অসুস্থ। অসুস্থ বলেই নানু তাঁর মেয়ের বিয়েতে জামাইকে চালু ব্যবসা আর প্রচুর নগদ টাকা দিয়েছিলেন। সেই ব্যবসা আর টাকা পেয়েছিলেন বলেই আব্বু আজ এত ধনী। ভেবে দেখেছিস, আব্বুর সয়-সম্পত্তি নিবি না বলে আসলে কার সয়-সম্পত্তি

নিতে অস্বীকার করছিস তুই? এ-সবের উৎস তো নানুর টাকা। আর নানুর টাকা মানে আম্মুর টাকা। তাহলে নিবি না কেন?'

মুখ থেকে হাত সরাল শিরিন। 'এ-সব থাক। তারিন, এখন আমি কি করব?'

'একটা কাজই করার আছে তোর। তবে তা করার আগে মৃদুলের আশা তোকে ছেড়ে দিতে হবে। আগে সিদ্ধান্ত নে, তা পারবি কিনা। তারপর বলে দেব কি করতে হবে।'

'কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। জীবনে আর কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারব না।'

'তাহলে মর।' ট্র্যাকস্যুট খুলে কাপড় পরতে শুরু করল তারিন। বাথরুমে ঢুকে গোসল করল, নাস্তা খেয়ে এল তিনতলা থেকে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজগোজ করছে।

'তোর কি মনে হয়, আমি যদি মৃদুলকে বলি বিয়ে করো, ও রাজি হবে না?' জিজ্ঞেস করল শিরিন।

'পাগলের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই,' জবাব দিল তারিন। 'এখনও তুই বুঝতে পারছিস না? মৃদুল ভাই সব জানে, সে-ই তার আব্বু-আম্মুকে দিয়ে কথাগুলো বলিয়েছে তোকে। কাপুরুষ!'

'ওকে পাবার তাহলে কোন উপায়ই নেই আমার?'

'না।'

মাথা নাড়ল শিরিন। 'আমি মেনে নিতে পারছি না। মৃদুলকে তুই যা খুশি তাই বল, কিন্তু আমি জানি আমাকে ভালবাসে ও। আমার প্রতি ওর ভালবাসায় সত্যি কোন খাদ নেই।'

'তাহলে তোকে বিয়ে করছে না কেন?'

'করবে না, সে-কথা এখনও আমি ওর মুখ থেকে শুনিনি।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হবে,' বলল তারিন। 'আমার ধারণা, মৃদুল ভাই বিকেলের মধ্যে ছুটে আসবে তোর কাছে। এমন ভাব

দেখাবে, যেন তার কোন দোষ নেই। আমার কথা তো শুনবি না, তবু বলে যাই তোর কি করা উচিত।'

'কি করা উচিত?'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারিন, হাতে একটা ঝাড়ু নিয়ে ফিরেও এল সঙ্গে সঙ্গে। 'এটা কাছে রাখ, এলেই ঝাড়ু মেরে বিদায় করে দি ···।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল শিরিন, এমন অকস্মাৎ অগ্নিমূর্তি ধারণ করল সে যে ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে যেতে হলো তারিনকে। 'আমার ব্যাপার আমি বুঝব!' হিসহিস করে বলল সে। 'আর যদি কখনও তোর মুখে মৃদুল সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনি, তোকে আমি বোন বলে স্বীকার করব না।'

কথা বাড়াবার সাহস হলো না তারিনের তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

তবে ওর কথাই সত্যি হলো। সন্ধ্যার ঠিক আগে সিঁড়িতে মৃদুলের পায়ের শব্দ হলো। সারাদিন কিছু খায়নি শিরিন। স্থির হতে না পেরে খোলা ছাদে পায়চারি করছে।

ছাদে উঠে শিরিনের দিকে তাকাল মৃদুল। শিরিনও তাকিয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে ছাদের এদিক ওদিক হাঁটছে মৃদুল। কাছে-দূরে তাকাচ্ছে। উদভ্রান্ত, দিশেহারা লাগছে ওকে। দু'জনের কেউই কোন কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে শিরিনের দিকে তাকাচ্ছে মৃদুল। খুবই ম্লান ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। যে দিকেই যাচ্ছে ও, নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছে শিরিনের দৃষ্টি।

তারপর এক সময় শিরিনের কাছাকাছি এসে রেলিঙে হেলান দিল মৃদুল। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না।

'তুমি অনেক আগে থেকেই সব জানো, তাই না?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল শিরিন।

মৃদুল চুপ করে থাকল। ওর যেন কিছু বলার নেই।

'তুমি সত্যি সত্যি এই বিনিময়ে রাজি হয়েছ?' আবার জিজ্ঞেস করল শিরিন। এবারও মৃদুল চুপ করে আছে দেখে শিরিনের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'তাহলে এসেছ কি মনে করে? ক্ষমা চাইতে?'

চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল মৃদুল। বিড়বিড় করে কিছু বলল, বোঝা গেল না।

'কিন্তু আমি তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করব না,' চেষ্টা করা সত্ত্বেও গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রাখতে পারল না শিরিন, ভেঙে গেল। 'তুমি শুধু কাপুরুষ নও। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমাকে বিয়ে করবে না, এ-কথা কোনদিন বুঝতে দাওনি। তোমাকে আমি ঘৃণা করি, মৃদুল।'

মৃদুল নড়ছে না। কথা বলছে না। চোখ তুলছে না।

'তুমি কোনদিন সুখী হতে পারবে না। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না শিরিন, মৃদুলের কাছ থেকে দূরে সরে এসে হাঁটাহাঁটি করছে। 'আমার অভিশাপ চিরকাল তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।' মৃদুল তবু কিছু বলছে না দেখে হঠাৎ যেন শিরিনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। 'সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? দয়া করে বিদায় হও। জীবনে আর কোনদিন আমার সামনে এসো না।' তারপর ছুটল সে, ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

দু'তিনবার ডাকার পর সাড়া দিল শিরিন। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজা লাগাল তারিন, তারপর আলো জ্বালল। দরজা খুলে দিয়ে নিজের খাটের এক কোণে বসে আছে শিরিন, ভাঁজ করা দুই হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকিয়ে। ওড়নাটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। শিরিনের মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তারিনের চোখ পড়ল তার বিছানার ওপর। একটা বালিশ প্রায় পুরোটাই ভিজে। শুধু তাই নয়, বালিশের কাভার আর চাদরের একটা প্রান্ত ফালি ফালি হয়ে আছে। বোঝা গেল, দাঁত দিয়ে ছেঁড়া হয়েছে ওগুলো।

'সারাদিন কিছু খেয়েছিস?' জিজ্ঞেস করল তারিন। তিন তলার এক ভাড়াটে ভদ্রমহিলার কাছে খায় ওরা।

শিরিন হাঁটু থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল। 'আমার খিদে নেই। তুই যদি খেয়ে এসে থাকিস, আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়।'

'এই অস্বস্তি নিয়ে কি করে শুই? কালপ্রিটটা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি চায় সে? তুই তাকে চলে যেতে বলিসনি কেন?'

মুখ তুলল শিরিন। 'কি বলছিস!'

'কেন, তুই জানিস না? বিশ্বাস না হয়, দরজা খুলে দেখ।'

শিরিন জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে এখন?'

হাতঘড়ি দেখল তারিন। 'সাড়ে আটটা।'

তারমানে সেই ছ'টা থেকে ছাদ থেকে নড়েনি মৃদুল। সত্যিই তো, কি চায় ও? সম্পর্কটা তো শেষই হয়ে গেছে, তারপরও এখানে থাকার মানে কি? 'তুই যা, গিয়ে বল ওকে আমি চলে যেতে বলেছি।'

মাথা নাড়ল তারিন। 'তখন না বললি, তোর ব্যাপার তুই বুঝবি? আমি গেলে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।'

খাট থেকে নামার সময় শিরিন ভাবল, খুব ভাল হত যদি আমাকে কেউ ফেলে দিত। ওড়নাটা তুলে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে, চোখ মুছল, হাত দিয়ে যতটা সম্ভব ঠিকঠাক করল মাথার চুল। ভাবছে কি বলবে মৃদুলকে। চলে যেতে বলা ছাড়া কিছুই তো আর বলার নেই।

দরজা খুলে ছাদে বেরিয়ে এল শিরিন। একবারে শেষ প্রান্তে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃদুল, অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে। ওর কাছ থেকে তিন-চার হাত দূরে দাঁড়াল শিরিন। খুব শান্ত ও নিচু গলায় কথা বলল সে। 'যদি বলি তুমি তোমার আব্বা-আম্মার অবাধ্য হও, যদি বলি কাল সকালে ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে নিয়ে গিয়ে আমাকে বিয়ে করো, তুমি রাজি হবে, মৃদুল?'

'তুমি বললে আমি আত্মহত্যা করতে পারি,' এই প্রথম কথা বলল মৃদুল।

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।'

মৃদুল বলল, 'আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি।' ভেবে দেখল না কথা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কিনা।

'কিন্তু বিয়ে করতে পারো না?'

'মা-বাবার অবাধ্য হওয়া ছাড়া তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব।'

'ঠিক আছে, তাঁদের বাধ্যই থাকো তুমি। যাও, মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলো। সুখী হও, এ-কথা আজ আমি বলতে পারব না। তবে তুমি ঠিকই জানো যে তোমার অমঙ্গল আমি চাইতে পারি না। এক সময় ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারব বলে মনে হয়। তখন তোমাকে অভিশাপ দেব না। তখন তোমার প্রতি আমার শুধু করুণা হবে। এখন তুমি যাও। এখানে কোন পুরুষমানুষ নেই, শুধু আমরা দু'বোন থাকি—এত রাত পর্যন্ত তোমার থাকাটা উচিত হচ্ছে না।'

মৃদুল বলল, 'আজ আমি তোমার কাছে এসেছিলাম···।'

'ক্ষমা চাইতে, এই তো? ঠিক আছে, দিলাম ক্ষমা করে। এখন তুমি যাও।'

'না, আমি ওধু ক্ষমা চাইতে আসিনি। আমি এসেছি···।'

'মৃদুল,' বাধা ছিল শিরিন, 'প্লীজ, চলে যাও। তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে।'

অসহায় বোধ করছে শিরিন। 'ঠিক আছে। কথা দাও, বলেই চলে যাবে। আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে না।'

'আজ সকালে তুমি চলে আসার পর বাড়ি থেকে একটা ফোন পাই আমি,' বলল মৃদুল। 'আমাকে একটা ক্লিনিকে যেতে বলা হয়। সেখানে

গিয়ে দেখি তাসমিনা আপাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। একটা শিশিতে অনেকগুলো ভ্যালিয়াম ছিল, তুমি চলে আসার পর সবগুলো খেয়ে ফেলেছে।'

'কি?' শিরিনের মনে হলো, শুনতে ভুল করছে সে। তারপর ভাবল, নাকি মিথ্যে কথা বলছে মৃদুল? 'তোমার বোন বিষ খেলো, আর তুমি এখানে আমার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছ?'

'আপার বিপদ কেটে গেছে। পাম্প করে স্টমাক থেকে বের করা হয়েছে সব। তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তোমার কাছে আসার সেটাই কারণ।'

'আমি কি করতে পারি?'

'আপার মরতে চাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছ তো?' জিজ্ঞেস করল মৃদুল। 'আমাকে বলল, তোর আর শিরিনের জীবনটা নষ্ট করে দেয়ার কোন অধিকার আমার নেই। হয় বিয়েটা ভেঙে দে, তা না হলে আবার আমি বিষ খাব।'

শিরিন চুপ করে থাকল।

'কিন্তু আব্বা বা আম্মা বিয়েটা ভেঙে দিতে রাজি নন। তারা আপাকে বোঝাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার আগের সেই সম্পর্ক নেই। তোমার সঙ্গে আমার বিয়েতে তোমার আব্বু রাজি নন, তাই আমাকে তুমি আভাসে জানিয়ে দিয়েছ আমাদের বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আজ সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁরা। তুমি নাকি তাঁদেরকে বলে এসেছ, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, সেটা বিয়ে পর্যন্ত কোনদিনই গড়াত না। কথাগুলো এমন কৌশলে বলা হয়েছে, কিছুটা হলেই বিশ্বাস করেছে আপা।'

শিরিন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার আব্বা-আম্মাকে নিয়ে গর্বিত নও? ছি!'

মৃদুল চুপ করে থাকল।

'এ-সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল শিরিন।

'আপা জেদ ধরেছে, কথাগুলো তোমার মুখে শুনলে তবে বিশ্বাস করবে,' বিড়বিড় করল মৃদুল।

'কি বলতে চাও তুমি? তোমার গুরুজনেরা একগাদা মিথ্যে কথা বলছেন, আমার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, অথচ তুমি আশা করো আমি তোমার আপাকে গিয়ে বলব—না, মৃদুলকে আমি ভালবাসি না?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না মৃদুল। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আপা যদি আবার বিষ খায়, এবং যদি মারা যায়, তোমার আমার বিয়েতে তাহলে আর কোন বাধা থাকে না। তুমি কি সেটাই চাও?' উত্তরের অপেক্ষা থাকল না। 'আসি,' বলে চলে গেল ও।

পাঁচ

ওরা দুই বোন তিনকন্যায় চলে আসার পর তিন মাস পার হতে চলেছে, এই সময় হঠাৎ একদিন তারিনের মাথায় ভূত চাপল। রেজাল্ট ওরও ভাল হয়েছে, তবে মাস্টার্স করবে না। ওর সাবজেক্ট কমপিউটর সায়েন্স, অথচ জেদ ধরেছে মডেলিং করবে।

কোন ব্যাপারেই আজকাল উৎসাহ বোধ করে না শিরিন, নিজের ওপর অত্যাচার না করলেও, অযত্ন আর অবহেলার সীমা নেই। তারিনের ব্যাপারেও মাথা ঘামায় না সে। কিন্তু তারিন ঢাকায় একটা মহিলা হোস্টেলে থাকবে, উদ্দেশ্য মডেল হবার ট্রেনিং নেয়া. শুনেই

ঘাবড়ে গেল। প্রথমে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে চেষ্টা করল তারিনকে। যুক্তির খাতিরে যদি মেনেও নেয়া যায় যে মডেলিং আজকাল আর নিন্দনীয় কিছু নয়, যেমন ভাবে খুশি বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে, তবু এ-ও তো বাস্তব সত্য যে মডেলিং বা অভিনয় শেখানোর কথা বলে যে-সব প্রতিষ্ঠান কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় সেগুলো শতকরা নিরানব্বুই ভাগই ভুয়া, লোক ঠকানোর কারখানা। তারিন জবাব দিল, 'আমি না ঠকতে চাইলে কে আমাকে ঠকায়!' অবশেষে রেগে গেল শিরিন। বলল, 'একা তোকে আমি ছাড়ি কিভাবে?' তারিন সমাধান দিল, 'তাহলে তুইও আমার সঙ্গে চল। আমার ফেস সুন্দর, তোর ফিগার। হয়তো তুইই নাম করবি।' কিন্তু তা সম্ভব নয়। তিনকন্যা ছেড়ে শিরিন কোথাও যাবে না। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাকিটা জীবন এখানেই পালিয়ে থাকবে সে। হ্যাঁ, পালানো ছাড়া আর কি বলা যায়। সে কি জীবনের কাছে হেরে যায়নি? জীবন কি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি?

শুধু মৃদুল অনুরোধ করায় নয়, তাসমিনা সত্যি বিষ খেয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার জন্যেও ওদের বাড়িতে গিয়েছিল শিরিন। না, মৃদুল মিথ্যে কথা বলেনি। তাসমিনাকে অসুস্থই দেখতে পায় সে। ওর সঙ্গে তার কথাও হয়েছে। কথা হয়েছে মানে, মৃদুলকে সে ভালবাসে না, সম্পর্কটা শুধুই বন্ধুত্বের, এই বক্তব্যটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছে শিরিনকে। শয্যাশায়ী তাসমিনার মুখে হাসি ফোটে। এইটুকুই শিরিনের পাওয়া। এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। তার সঙ্গে মৃদুলও বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়। রিকশা পেতে দেরি হচ্ছিল, সময়টুকু অনর্গল প্রলাপ বকছিল মৃদুল। ওকে যেন ভুলে না যায় শিরিন। কারণ, মৃদুল তাকে চিরকাল ভালবাসবে। বিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে হলেও, শিরিনের ছবিগুলো চিরকাল সযত্নে সংরক্ষণ করবে ও। শিরিন আপত্তি না করলে,

এখনকার সম্পর্কটা ধরে রাখতে চায় মৃদুল। আগের মতই দেখা হবে ওদের। বেড়াতে বেরুবে দু'জন। চাইনীজ খাবে। উপহার বিনিময় করবে। চিঠি লিখবে। দু'জনের জীবনই তো ধ্বংস হয়ে গেল, তাই না? কেউ তারা সুখী হতে পারবে না। সারাটা জীবন ব্যথা ও বেদনার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে দু'জনকে। তবু যেন যোগাযোগটা থাকে। পরস্পরের নির্মল সান্নিধ্য থেকে নিজেদেরকে য়েন ওরা বঞ্চিত না করে।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগেনি শিরিনের, আসলে সব কথা ভাল করে শুনতে পায়ওনি সে। তবে মৃদুল ঠিক কি বলতে চায় বোঝার পর রাগ হওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু রাগ কেন, কোন অনুভূতিই জাগেনি। নিঃশব্দে চলে এসেছিল সে, একটা কথাও না বলে।

কিন্তু মৃদুল তার পিছু ছাড়েনি। আগের মতই প্রতিদিন দেখা করেছে। প্রথম দিকে বাধ্য হয়ে কঠিন হতে হয়েছিল শিরিনকে। 'তোমাকে দেখলে আমি বিরক্ত হই,' এ-ধরনের কথা বলেছে। এমন কি এ-ও বলেছে, 'তুমি এতটা নির্লজ্জ হতে পারো তা আমার জানা ছিল না।' তবু মৃদুল আসা-যাওয়া বন্ধ করেনি। নিজে পারছে না দেখে তারিনের সাহায্য নিল শিরিন। মৃদুল আসতে তারিন একদিন অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ল। কিন্তু মৃদুল নীরব, মুখ বুজে সহ্য করল সব। পরদিন আবার এল সে। 'ভাল আছ?' বলে চলে গেল। এরকম প্রায় রোজই ঘটতে লাগল। তারপর তাসমিনার বিয়ের দিন এসে গেল। ওই একই দিনে মৃদুলেরও বিয়ে। এক হপ্তা আগে থেকে শিরিনের হাতে-পায়ে ধরতে শুরু করল মৃদুল, ওদের ভাই-বোনের বিয়েতে তাকে যেতেই হবে। এক শর্তে রাজি হলো শিরিন, বিয়ের পর আর মৃদুল তাকে বিরক্ত করবে না।

তাসমিনার মত অতটা না হলেও, মৃদুলের স্ত্রী শায়লাকে কুৎসিতই বলতে হবে। তবে দেখতে খারাপ বলে মেয়েটার মননে-চিন্তনে কোন কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে বলে মনে হলো না। বিয়ের দিনই তাকে খুব

সপ্রতিভ ও চালাক-চতুর মনে হলো। আর তার ভাই, তাসমিনার স্বামী মোবিন সিকদারকে মনে হলো সরল ও বোকাসোকা।

কথা ছিল বিয়ে হয়ে যাবার পর শিরিনের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবে না মৃদুল। কিন্তু পরদিনই আবার এসে হাজির। দেখেই রেগে গেল শিরিন। অপমানকর কোন কথাই বলতে বাকি রাখল না। মাথা নিচু করে সব শুনল মৃদুল। তারপর চলে যাবার সময় বলল, 'তোমাকে আমি ভুলতে পারছি না। কি করব বলে দাও।'

পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল শিরিন, 'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ? আমি কি জানি!'

দু'দিন পর আবার এল মৃদুল। তবে বসল না। বলল, 'রাগ কোরো না, আমি চলে যাচ্ছি।' গেলও চলে।

যত যা-ই হোক, মৃদুলকে শিরিন ভালবেসেছিল। তাকে পাওয়া হয়নি, কোনদিন হবেও না, এ-কথা জানার পরও সেই ভালবাসা নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে সময় তো দরকার। একা থাকতে পারলে ওকে ভুলে যেতে সময়টা কম লাগত শিরিনের। কিন্তু মৃদুল ওকে একা থাকতে দেবে না। ফলে শিরিন ওকে ভুলতে তো পারছেই না, বরং ওর প্রতি ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে মনটা।

একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে ছাদে উঠে এল মৃদুল। দেখেও শিরিন কোন প্রশ্ন করে না, কিন্তু সেদিন মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'কি হয়েছে?'

'সব কথা শায়লাকে আমি বলে দিয়েছি,' রুদ্ধশ্বাসে বলল মৃদুল। 'কিছুই গোপন করিনি। আরও বলেছি, আমি কোন সন্তান চাই না, কারণ তাকে আমি ভালবাসি না। আমি ভালবাসি তোমাকে।'

ঘরে ঢুকে মৃদুলের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল শিরিন। মৃদুলের বিয়ের পর সেদিনই প্রথম সারা রাত কাঁদল সে।

এক হপ্তা পর দুই বোন আলোচনা করল, এ সমস্যার সমাধান কি? সমাধান একটাই। তিনকন্যায় পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনকন্যায় এসেও

শান্তিতে নেই শিরিন। অফিস কামাই করে মৃদুল এখানে আসতে পারছে না ঠিকই, তবে প্রতি হপ্তায় দু'তিনটে করে চিঠি লিখছে। 'আমি ভাল নেই, আমি সুখী নই,' এই সবই শুধু লেখে। লেখে, 'তোমার অভিশাপ লেগেছে আমাকে। জানি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু দেখো, হঠাৎ একদিন আমি পাগল হয়ে যাব।'

চিঠিগুলো পড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় শিরিনের। কখনও রাগ হয়, কখনও কান্না পায়, আবার মাঝে মধ্যে ঘৃণাও জাগে। মাঝখানে মৃদুলের অনেক চিঠিই খুলত না সে। না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিত। দু'একদিন পর ব্যাকুল একটা ভাব জাগে মনে, কি লিখেছিল জানা হলো না! পরের চিঠিগুলো আর না পড়ে ছেঁড়ে না।

যেটা বলে সেটা করেই ছাড়ে তারিন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কাজের পিছনে প্রস্তুতি থাকে ওর। হোস্টেলের কামরা আগেই ভাড়া নিয়ে ফেলেছে ও। এমন কি এক মহিলা পরিচালিত একটা মডেলিং প্রতিষ্ঠানে ডাকযোগে নামও লিখিয়েছে। শিরিন বুঝতে পারল, ওকে বাধা দেয়ার সাধ্য তার নেই। অগত্যা একগাদা উপদেশ দিয়ে বোনকে বিদায় জানাতে হলো। সঙ্গে বিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল তারিন, বলে গেল মাসে মাসে দশ হাজার করে মানি অর্ডার করতে হবে তার নামে। ওদের কক্সবাজারের বাড়িতে একটা লেটার বক্স আছে, সব চিঠি সেখানেই আসে, প্রতি হপ্তায় সেগুলো তিনকন্যায় নিয়ে আসে মান্না শেখ। তারিন কথা দিয়ে গেল, প্রতি হপ্তায় চিঠি লিখবে শিরিনকে।

তারিন চলে যাবার পর দু'মাস পার হয়ে গেছে, এই দু'মাসে তার চিঠি এসেছে মাত্র দুটো। ওর ট্রেনিং এখনও শুরু হয়নি, ঢাকায় নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটে যাওয়ায় সময়টা দারুণ উপভোগ করছে, এই সব লিখেছে। বড়বোন সুলভ উপদেশ দিয়ে জবাব দিয়েছে শিরিন।

তার সময় কাটে সকাল-বিকাল সৈকতে হাঁটাহাঁটি করে। কাঁটাতারের ছেঁড়া বেড়া গলে মাঝে মধ্যে শ্বেতবসনার পিছন দিকের

গভীর জঙ্গলেও যায় সে, সঙ্গে চোছিন রাখাইন, চিরল চাকমা, লোভা সুন্দরী আর চান্দা থাকে। দু'একটা বুনো শূকর দেখতে পেলে আব্বুর পুরানো রাইফেলটা দিয়ে গুলি করে শিরিন। গুলি করেই পিছন ফিরে ছুট দেয়, আহত শূকর যদি তাড়া করে! তবে শিকারে বেরুলে দু'একটা খরগোশ না নিয়ে ফেরে না।

সময় কাটানোর আরও অনেক উপায় বের করে নিয়েছে শিরিন। লোভা ও চান্দা দুই বোন, বাঁশ আর কাপড় দিয়ে ভারি সুন্দর সব পুতুল তৈরি করে ওরা, তাদের কাছ থেকে শিরিনও শিখে নিয়েছে কাজটা। প্রায়ই ওদের বাড়িতে যায় সে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে পুতুল তৈরি করে। কক্সবাজারের লাইব্রেরী থেকে অনেক বইও কিনে আনিয়েছে, বেশিরভাগই গল্প-উপন্যাস, সেগুলো পড়েও সময় কাটে। ইতিমধ্যে ট্রলার চালানোটাও চোছিনের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। তবে একা কখনও চালায় না বা সৈকত থেকে বেশি দূরেও যায় না।

এভাবেই দিন কাটছিল। জীবনে আপাতত বড় কোন সংকট নেই। তবে ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই। স্বপ্ন ও সাধ যা ছিল, সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে শিরিন। শেষ পর্যন্ত তার কি হবে, এই চিন্তা মাথায় ঢুকতেই দেয় না। যাচ্ছে দিন যাক চলে। সে গ্রাহ্য করে না।

প্রতি সোমবারে কক্সবাজার থেকে ওদের সাপ্তাহিক বাজার নিয়ে আসে রাজহংস। শ্বেতবসনায় এখন শিরিন থাকায় হপ্তায় আরও দু'দিন আসে মান্না শেখ, দেখে যায় সে কেমন আছে বা তার কিছু লাগবে কিনা। হঠাৎ এক রোববারে এসে হাজির হলো সে, শ্বেতবসনায় উঠে এসে শিরিনকে অদ্ভুত এক খবর দিল।

মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে শিরিন বলল, 'কার কথা বলছ, মান্না কাকা? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। কে তিনি, প্রতি বছর

তিনকন্যা দেখতে আসেন?'

'মা জননী, তুমি ভুলে গেছ।' মাথা চুলকায় মান্না শেখ। 'সে আজ তিন সাড়ে তিন বছর আগের কথা। সওদাগর সাহেব যেদিন বিবিসাহেবাকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন, সেদিনই প্রথম এসেছিলেন ভদ্রলোক। তখন ভোর, তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলে তুমি, ফিরে এসে ভদ্রলোকের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। তার নাম তারিক হাসান। সাহেব তিনকন্যা বিক্রি করবেন কিনা জানতে এসেছিলেন···।'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শিরিন। 'মনে পড়ছে।' মনে না পড়ার কথা নয়। পাহাড়ী পথে একা একা হাসছিল সে, সুদর্শন অচেনা আগন্তুকের সামনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। এ-ও মনে আছে, ভদ্রলোককে পাশ কাটিয়ে আসার পর পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি সে, সেজন্যে তখন নিজেকে নিয়ে কি গর্বই না অনুভব করেছিল। হায়, সেটা ছিল শিরিনের ভালবাসার মরশুম। সেই ভালবাসা তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। 'তা কি চান তিনি? আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?'

'তোমরা তো শ্বেতবসনায় ছিলে না, কিন্তু প্রতি বছর জাপান থেকে দেশে ফিরলেই তিনকন্যায় একবার আসতেন উনি,' বলল মান্না শেখ। 'কক্সবাজার থেকে আমিই তাঁকে নিয়ে আসতাম। তোমরা কোথায় থাকো, কোথায় লেখাপড়া করো, ইত্যাদি হাজারটা কথা জানতে চাইতেন। কিন্তু আমি কি আর বলি। যাই হোক, এবারও জাপান থেকে ফিরে কক্সবাজারে চলে এসেছেন। তুমি শ্বেতবসনায় আছ, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস না করে তাঁকে আমি আনতে চাইছি না।'

'কেন আসতে চান, জিজ্ঞেস করোনি?'

হেসে ফেলল মান্না শেখ। 'গত কয়েক বছর ধরেই তো শুনছি, জিজ্ঞেস করতে হবে কেন। তাঁর খুব শখ তিনকন্যায় বিশাল একটা

পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। আমাকে বলেছেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দর জায়গার মধ্যে তিনকন্যার নাম আসে। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন, শুধু তিনকন্যাকেই মনে হয়েছে মাটির বুকে এক টুকরো স্বর্গ।'

'কিন্তু আব্বু তো তাঁকে মানা করে দিয়েছিলেন। তিনকন্যা আমরা বিক্রি করব না। তবু কেন আসছেন তিনি?'

'লেগে থাকছেন, যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত বদলায়। তাঁকে কি বলব, মা?'

'না। বলবে, এ-ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। এখানে তিনি আসুন, এ-ও আমি চাই না।'

মাথা চুলকাল মান্না শেখ। 'আমি বলি কি, মা, একবার দেখা করে বুঝিয়ে বললে ভাল হত। তা না হলে কিছু দিন পরপরই বিরক্ত করবেন।'

'না, মান্না কাকু। কারও সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় না। আপনি তাঁকে আসতে মানাই করে দেবেন।'

'ঠিক আছে, মা জননী।' মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেল মান্না শেখ।

পরে শিরিন ভাবল, তারিক হাসান—নামটা বেশ। তারপর সারাদিন বেশ কয়েকবারই ঘুরেফিরে পুরানো সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল তার। দেখা গেল সেদিন যে লজ্জা পেয়েছিল, সেটা এখনও আছে, পুরোপুরি মুছে যায়নি। এক সময় নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করল শিরিন, দৃশ্যটার কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে কেন?

পরদিন সকালে অবশ্য তারিক হাসানের কথা তার মনে থাকল না। কালই কক্সবাজারে ফিরে গেছে মান্না শেখ, আজ সকালে আবার সে আসবে সাপ্তাহিক বাজার নিয়ে। বাজার আসে বলে সোমবার সকালে সৈকতেই অপেক্ষা করে শিরিন। হাতে একটা তালিকা রাখে, মান্না শেখ কি কি আনতে ভুলে গেছে জানিয়ে দেয়।

ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে সূর্য ওঠার পরও শ্বেতবসনায় ওঠেনি শিরিন।

সালোয়ার-কামিজ পরে আছে সে, ওড়নাটা গলায় পেঁচানো। হাতে বেতের ছোট্ট একটা ঝুড়ি থাকলেও, অল্প কয়েকটা ঝিনুক তুলেছে সে। হাঁটতে হাঁটতে জেটির কাছে ফিরে আসছে, দূরে দেখা গেল রাজহংসকে।

জেটির ওপর উঠে অপেক্ষা করছে শিরিন। রাজহংসের ডেকে একা শুধু মান্না শেখকে নয়, তার সঙ্গে আরও দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে সে। একজনকে চেনে, রোয়াং মং, মান্না শেখের সহকারী। দ্বিতীয় জনকে চেনে বললে ভুল হবে, যদিও কয়েক বছর আগে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তাঁকে দেখেছিল শিরিন। মান্না শেখের ওপর মনে মনে খুব রাগ হলো তার। মানা করা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে কেন নিয়ে আসছে সে?

জেটিতে ভিড়ল রাজহংস। মাল-পত্র নামানো হচ্ছে। কি আনা হয়েছে বা কি আনা হয়নি, এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না শিরিন। অপেক্ষা করছে মান্না শেখ কি ব্যাখ্যা দেয় শোনার জন্যে। রাজহংসের ডেকে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে জাপান ফেরত নাছোড়বান্দা। শিরিন ভাবল, এ-ও বোধহয় মৃদুলেরই কার্বন কপি, নির্লজ্জের চূড়ান্ত।

মাল-পত্র নামানো শেষ হয়েছে। সেগুলো কাঁধে করে শ্বেতবসনায় তুলে দিয়ে যাচ্ছে মায়মা, চিরল আর চোছিন। অবশেষে জেটিতে নামল মান্না শেখ, তার পিছু নিয়ে তারিক হাসান।

'উনি কেন এলেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল শিরিন।

মান্না শেখ মাথা চুলকে বলল, 'ওঁনার কাছে তারিন মা একটা চিঠি দিয়েছেন।'

এবার তারিক হাসানের দিকে বাধ্য হয়ে তাকাতে হলো শিরিনকে। 'তারিন? আপনার হাতে চিঠি দিয়েছে? আপনার সঙ্গে তার কোথায় দেখা হলো? সে ভাল আছে তো?' অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার।

অভয় দিয়ে হাসল হাসান। শিরিন লক্ষ না করে পারল না ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। 'না-না, চিন্তার কিছু নেই—আপনার বোন ভাল আছে,' আশ্বস্ত করল ও। 'দেখা হলো কণ্ঠমাধুর্যে। কণ্ঠমাধুর্য—ঢাকার বেইলী রোডে ওটা, আবৃত্তি শেখানো হয়। আপনার বোন তারিন ওখানে ভর্তি হয়েছে। আমিও ওখানকার পুরানো ছাত্র, দেশে ফিরলে মাঝে মধ্যে যাই।'

'ও,' বলে অপেক্ষা করছে শিরিন। তার ভাবটা যেন, চিঠিটা দিয়ে হাসান চলে গেলেই পারে।

যেন সেটা বুঝতে পেরেই হেসে ফেলল হাসান, বলল, 'আমি কিন্তু শুধু চিঠিটা দিতে আসিনি। আপনার সঙ্গে কিছু কথাও ছিল।'

'কথা মানে তো তিনকন্যা বিক্রি করতে রাজি করানোর চেষ্টা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'দুঃখিত। উত্তরটা হলো—না।' এক সেকেণ্ড পর আরও কর্কশ সুরে যোগ করল, 'আপনার বোঝা উচিত, স্বর্গ সহজে কেউ বিক্রি করতে চায় না।'

'বুঝি বৈকি,' বলল হাসান, দু'কোমরে হাত রেখে এখনও হাসছে ও। 'স্বর্গ বিক্রি করতে চাওয়া গুরুতর অন্যায়ও বটে। তবে যার আছে তার কি উচিত নয় কম ভাগ্যবানদের সঙ্গে শেয়ার করা? তিনকন্যা আমি আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছি, এ কিন্তু সত্যি নয়।'

'তাহলে কি চাইছেন আপনি?'

'দেখতে চাইছি এই জায়গাটার উন্নতি হয়েছে। আপনারা রাজি হলে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে পারি। ব্যবসার অংশীদার হতে আপনারা যদি রাজি না হন, জায়গাটা আমরা লীজ নিতে চাই।'

'আমরা মানে?'

হাসান বলল, 'আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছি। সাত কোটি টাকা পুঁজি আমাদের। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবেই এখানে আমার আসা। এই জায়গার উন্নতি করতে হলে সাত কোটি

টাকায় কিছুই হবে না। তবে ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সব কথা কি বলা যায়? আপনি আমাকে শ্বেতবসনায় নিয়ে গিয়ে এক কাপ চা খেতে বলবেন না?'

কঠিন হলো শিরিনের দৃষ্টি। ইচ্ছে হলো বলে, আমার সামনে থেকে দূর হোন। কিন্তু ভদ্রতায় বাধল। ঠাণ্ডা সুরে বাধ্য হয়েই বলতে হলো, 'ঠিক আছে, আসুন।'

জেটি থেকে নেমে তিন পাহাড়ের দিকে হাঁটছে ওরা। সৈকতের দিকে পাহাড়গুলোর গা একদম খাড়া, সেদিকে একটা হাত তুলে হাসান বলল, 'আচ্ছা বলুন তো, এখানে একটা এলিভেটর থাকলে চমৎকার হত না? এখন পাহাড়ী পথ বেয়ে শ্বেতবসনায় উঠতে লাগে প্রায় বিশ মিনিট, এলিভেটর থাকলে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে আবার নেমে আসতে পারতেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ল শিরিন। 'এলিভেটর?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তিনকন্যায় এলিভেটর? আপনার কি মাথা খারাপ হলো?'

'জানেন, জাপানে প্রায় সব পাহাড়েই ওঠার জন্যে এলিভেটর আছে।'

'ছবিতে দেখেছি বটে,' স্বীকার করল শিরিন। 'কিন্তু এখানে ও-সব কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়। কে এখানে এলিভেটরে চড়বে? মাত্র কয়েক ঘর লোক বাস করে এখানে। তারা সবাই, আমরাও, হাঁটতেই পছন্দ করি।'

হাসান বুঝতে পারছে, বিড়ালের ভাগ্যে সহজে শিকে ছিঁড়বে না। বলল, 'হাঁটা এক্সারসাইজ হিসেবে খুব ভাল।'

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠছে ওরা। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। 'আপনার মনে পড়ে?' শিরিনকে জিজ্ঞেস করল। 'এখানেই আপনাকে প্রথমদিন দেখি আমি?' মনে মনে বলল, সেই থেকে

আপনাকে আমি ভুলতে পারিনি। শুধু তিনকন্যা নয়, এই অধম আপনারও প্রেমে পড়ে গেছে।

'কি জানি,' বলল শিরিন। 'হবে হয়তো।'

'আপনি কিন্তু সাংঘাতিক লজ্জা পেয়েছিলেন,' বলল হাসান, হাসছে।

'তাই? তা-ও আপনার মনে আছে? আশ্চর্য তো!' গলার আওয়াজই বলে দিল, ব্যঙ্গ করছে শিরিন।

শ্বেতবসনায় উঠে এল ওরা, পথে আর কোন কথা হলো না। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল চান্দাকে। তারিন চলে যাবার পর শিরিনের সঙ্গে শ্বেতবসনাতেই থাকে সে, আলাদা একটা ঘরে ঘুমায় রাতে। মাঝে মধ্যে লোভাকেও ডেকে নেয় শিরিন। দু'বোনের মধ্যে বয়েসের পার্থক্য মাত্র এক বছরের, দু'জনেই কক্সবাজারে খ্রিস্টানদের একটা মিশনারিতে খানিকদূর লেখাপড়া শিখেছে। চান্দা একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে, সে-ও চাকমা। লোভা প্রেম করবে কি, ছেলে দেখলে দশ হাত দূরে সরে যায়।

দু'বোনের মধ্যে চান্দাই বড়, তার মাথায় সারাক্ষণ দুষ্ট বুদ্ধি গিজগিজ করছে। শিরিনের সঙ্গে হাসানকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'আপা, জানালা দিয়ে দেখলাম রাজহংস থেকে তোমাদের মেহমান নামলেন। তাই ডাইনিং রুমে দু'জনের নাস্তা দিয়েছি। হাত-মুখ ধুয়ে বসে পড়ুন,' শেষ কথাটা হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও শিরিনকে বলতে হলো, 'হ্যাঁ, আসুন, নাস্তাটা সেরে ফেলা যাক।'

খেতে বসে হাসান জানতে চাইল, 'এত বড় বাড়ি, তা-ও এরকম নির্জন পাহাড়ের মাথায়, একা থাকতে আপনার ভয় করে না?'

'একা কোথায় দেখলেন। পাহাড়ের মাথায় আমরা চার-পাঁচটা পরিবার বাস করি। রাতে আমার সঙ্গে চান্দা থাকে।'

'ঝড় উঠলে কি করেন? ধরুন দশ নম্বর বিপদসংকেত দেখাতে বলা হলো, তখন?'

'পাহাড়ের ওপর থাকি, জলোচ্ছ্বাসকে ভয় পাবার কারণ নেই,' বলল শিরিন। 'আর ঝড় খুব মারাত্মক হয়ে উঠতে দেখলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নেমে যাই আমরা—শ্বেতবসনার নিচে বলতে পারেন আলাদা একটা বাড়ি আছে। নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র।'

'আপনি শহরে যান না?'

'মাঝে মধ্যে যাই বৈকি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল শিরিন, ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করাটা পছন্দ করতে পারছে না।

'আপনার আব্বু কি লণ্ডন থেকে কোনদিনই আর ফিরবেন না?'

'এ-সব প্রশ্ন থাক,' বলতে বাধ্য হলো শিরিন।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল হাসান। 'এখানে কোন স্কুল নেই, তাই না?'

'কোন বাচ্চাকাচ্চাও নেই।'

'ডাক্তারখানা? পোস্টঅফিস? দোকানপাট? মসজিদ?'

শিরিন গম্ভীর হয়ে গেল। 'তিন-চার বছর ধরে আসা-যাওয়া করছেন, ও-সব যে এখানে নেই তা আপনি খুব ভাল করেই জানেন, তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

হেসে উঠল হাসান।

'আপনি হাসছেন কেন?' রাগ চেপে জিজ্ঞেস করল শিরিন। কাউকে নাস্তা খেতে বসিয়ে অপমান করা যায় না।

'হাসছি এইজন্যে যে এখানে আপনারা আসলে কেউ জীবনযাপন করছেন না। একে বেঁচে থাকা বলে না। বিশেষ করে আপনার জন্যে কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে বলি—আপনার মত সুন্দরী একটা মেয়ে এখানে একা থাকে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

বিশাল ডাইনিং রুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। টেবিলটা এত লম্বা, এবং

ওরা দু'জন দুই প্রান্তে বসায়, মাঝখানে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে; সেই দূরত্ব অতিক্রম করে হাসানের চোখের তারায় মনের কথা পড়তে চেষ্টা করল শিরিন নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে। তার কোন ধারণা নেই তারিক হাস্যান নামে এই দুর্দান্ত তরুণ তার বিষাদময় জীবন ধারায় তুমুল একটা ঝড় তুলতে যাচ্ছে, যে ঝড়ের কবলে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে সে, তবু ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না, আত্মসমর্পণের প্রবল তাগাদা অনুভব করলেও পুরুষদের প্রতি ঘৃণার কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করবে ওকে। নিচু গলায় কথা বলছে শিরিন, 'এখানে কোন স্কুল নেই তার কারণ ছাত্র পাওয়া যাবে না। একটা মাদ্রাসা ও মসজিদ তৈরি করার কথা ভাবা হয়েছিল, কিন্তু আব্বু বিদেশে চলে যাবার পর মাথা ঘামানোর কেউ নেই। মাসে দুই তিনবার সবগুলো পরিবারের সদস্যরা শ্বেতবসনায় জড়ো হয়, আমরা গান করি, নাচি, মাঝে মধ্যে অভিনয়ও করি।' তারপর হেসে ফেলল সে। 'এ-সব কথা কেন আপনাকে শোনাচ্ছি আমি?'

'শুনে মনে হলো না এখানে আপনি খুব সুখে আছেন,' খানিক পর নরম সুরে বলল হাসান। 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু চাইতে হবে। তাহলেই দেখবেন সব কেমন মজার ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে।'

'কিভাবে?'

ন্যাপকিনটা টেবিলে নামিয়ে রাখল হাসান। 'আপনার শেষ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আপনি আরও এক কাপ কফি নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হাসান। 'সকালটা আজ ভারি সুন্দর। আমরা কি বাইরে গিয়ে বসতে পারি, তারপর আমার কথা খুলে বলব আমি?'

উঠে দাঁড়াল শিরিন। 'হ্যাঁ, চলুন। ওই জানালার বাইরে বাগানে বসতে পারি আমরা, ওখান থেকে নিচের সাগর দেখা যায়।'

বাগানে বেরিয়ে এসে কংক্রিটের বেঞ্চে বসল ওরা। বাগানে

অনেকগুলো মর্মরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাসান। শুরু করতে ইতস্তত করছে ও। বাধ্য হয়ে তাগাদা দিতে হলো শিরিনকে। 'হ্যাঁ, বলুন। আমি চাই না আপনি শুধু শুধু নিজের সময় নষ্ট করেন।'

'বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করব। আপনার আব্বুর সঙ্গে কথা বলার সময়ই আমি বুঝতে পারি, তিন কন্যাকে নিয়ে আমার আশা কোনদিনই পূরণ হবে না। কিন্তু সেদিন ফিরে যাবার সময় আপনাকে দেখে কি যে হলো আমার, মনে হলো আপনাকে ভাল করে ধরতে পারলে আমার স্বপ্ন সফল হবে। ভব্যতায় বাধছে, কাজেই সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া আমি ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকছি। শুধু এইটুকু বলি, সেদিনের পর গত কয়েক বছর বারবার তিনকন্যায় ছুটে এসেছি শুধু আপনার সঙ্গে···আলোচনা করার জন্যে। দেখা হলে কি বলব, তার অনেক রিহার্সেল দিয়েছি মনে মনে। কিন্তু আজ সে সুযোগ পেয়েও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব। এখন শুধু একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখার তাগাদা অনুভব করছি, আপনাকে যেন কোন ভাবে আঘাত দিয়ে না ফেলি। আমার ওপর আপনার যদি রাগ হয়, প্লীজ, মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে ইচ্ছা করে আপনাকে আমি আঘাত দেব না।'

'আপনার ভূমিকা শেষ হয়েছে?'

'এবার জাপান থেকে ফেরার পর আপনার বোনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে,' বলল হাসান, শিরিনের কথায় যদি হতাশ হয়ে থাকেও, চেহারায় তার কোন প্রকাশ নেই। 'আমার প্ল্যান সমর্থন করেছেন তিনি। তবে এ-ও বলেছেন যে আপনাকে রাজি করা সহজ হবে না। বলেছেন, আপনি পরিবর্তন পছন্দ করেন না।'

হাত বাড়িয়ে একটা গোলাপ ছিঁড়ল শিরিন। নিচের সৈকতে তাকিয়ে আছে। ভাবছে; আমার সম্পর্কে ভদ্রলোককে আর কি বলেছে তারিন?

'বোর্ড মীটিঙে আমার কোম্পানীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আলাপ

করেছি,' আবার শুরু করল হাসান। 'ওরা আমাকে চুক্তি করার অধিকার দিয়েছে। এবার সংক্ষেপে আমার প্রস্তাবটা বলি। আপনাদের এই তিনকন্যা আমার কোম্পানী একুশ বছরের জন্যে লীজ নিতে চায়।'

'উত্তরটা আপনাকে আগেই দেয়া হয়েছে। না।'

চোখ মিটমিট করল হাসান, তবে ওর গলা অস্বাভাবিক শান্ত। 'লীজের জন্যে এককালীন মোটা টাকা পাবেন আপনারা। সঙ্গে থাকবে বাৎসরিক ভাড়া। একুশ বছর পর যদি লীজ রিনিউ করতে না চান, সমস্ত নির্মাণ কাজ ও ইমারত সহ তিনকন্যা ফিরে পাবেন আপনারা—তার মধ্যে থাকবে বড়সড় একটা আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, বার-রেস্তোরাঁ, শিশুপার্ক, কার পার্কিং, আধুনিক জেটি, তিন-চারটে লঞ্চ, এলিভেটর, স্বয়ংসম্পূর্ণ আট-দশটা কটেজ, শপিং সেন্টার। সব মিলিয়ে পনেরো থেকে বিশ কোটি টাকার সম্পত্তি। চুক্তি নবায়ন না হলে এ-সব দিয়ে দিতে হলেও, কোম্পানীর লোকসান হবে না। একুশ বছরে খরচের কয়েকগুণ টাকা কামিয়ে নেব আমরা। কত টাকায় আপনারা লীজ দেবেন, বাৎসরিক ভাড়া কত ধরা হবে, এ-সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনারাই দেবেন। আপনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করে দেখবে আমার কোম্পানী। দরে বনলে কাজে হাত দেব আমরা।'

শিরিন হিসহিস করে বলল, 'আপনাদের টাকা আমার দরকার নেই। আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি ও-সবের ঊর্ধ্বে।'

'আপনার যদি টাকার দরকার না-ও থাকে, অন্যদের আছে। তিনকন্যার উন্নতি হলে আশপাশের বহু লোকের আয়-রোজগারের অনেক পথ খুলে যাবে। এখানে পোস্টঅফিস বসবে, টেলিফোন আসবে, কক্সবাজার পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি হবে, কোচ সার্ভিস চালু হবে। ভেবে দেখেছেন, কত লোক কাজ পাবে তখন? কোম্পানীকে এখনও জানাইনি, তবে আমার প্ল্যান আছে শ্বেতবসনার পিছনে একটা

চিড়িয়াখানা করব। দেশী-বিদেশী পর্যটকরা এসে অবাক হয়ে যাবে···।'

'একবার তো বলেছি—না।'

'এই না শুধু আপনার জবাব,' বলল হাসান। 'প্রত্যেক বছর এসে এখানকার অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সবাই তারা তিনকন্যার পরিবর্তন চায়। ফরেন কারেন্সি আয় হবে, তাই সরকারও আমার প্ল্যান অনুমোদন করবে।'

'এখানকার কার সঙ্গে কথা বলেছেন আপনি?'

'বলুন কার সঙ্গে নয়। রাখাইন আর চাকমাদের প্রতিটি পরিবার রাজি। বাঙ্গালী পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে।'

'দু'একজনের নাম বলতে পারেন?'

'চোছিন, মায়মা, চিরল—সবাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমনকি মান্না শেখও রাজি। তবে আপনাকে ওরা ভয় পায়, নাম বলতে মানা করেছে। আমার কথা হলো, শুধু নিজের কথা না ভেবে ওদের কথাও একটু ভাবুন।'

'তিনকন্যায় ওদেরকে থাকতে দিয়েছি আমরা,' বলল শিরিন। 'আর কি চায় ওরা? এখান থেকে ওরা যা আয় করে আমরা তাতে ভাগ বসাই না। রাজহংসের কথাই ধরুন। অনেক আগে কানু শেখ চালাতেন ওটা, এখন তাঁর ছেলে মান্না শেখ চালাচ্ছে। মাসের পনেরো-বিশ দিন ভাড়া খাটে ওটা, কিন্তু সেই টাকা আমরা নিই না। তারপরও ওরা যদি ভাবে···।'

'একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখুন ব্যাপারটাকে,' হাসানের গলায় অনুরোধের সুর। 'তিনকন্যায় আমরা গ্যাস, স্যানিটেশন, ইলেকট্রিসিটি, হেলথ সার্ভিস, ফেরী সার্ভিস, হেলিকপ্টার, সী-প্লেন, আবাসিক ডাক্তার ও নার্স আনতে চাইছি। এখন কি পাচ্ছে ওরা আর তখন কি পাবে, পার্থক্যটা আশা করি আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই আপনাকে।'

'আপনার কথার সারমর্ম তো এই যে টাকা ঢালবেন আরও টাকা

কামাবার আশায়, তাই না?'

'আরও টাকা কামানো অপরাধ নয়। আর একা শুধু আমি বা আমার কোম্পানী টাকা কামাবে না। প্রচুর টাকা আপনারাও পাবেন। শুধু আমরা আর আপনারা না, তিনকন্যার সবাই ভাল রোজগার করবে। এখান থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যেখানে যে আছে, সবাই উপকৃত হবে। আমি কথা দিচ্ছি, প্রতিটি কাজে আপনার মতামত চাওয়া হবে। আপনার পছন্দ নয়, এমন কোন কাজ অবশ্যই করা হবে না। চিড়িয়াখানাটা শ্বেতবসনা থেকে দেখা যাবে না। আসা-যাওয়ার পথটাও দূরে থাকবে, আপনাদের প্রাইভেসী যাতে নষ্ট না হয়। আপনি অনুমতি দিলে শ্বেতবসনারও সংস্কার করব আমরা।'

'আমি যেন অনুমতি দেব!'

'দেয়া উচিত। শুধু কোন বোকাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে।'

'তাহলে আমি সেই বোকাই। তিনকন্যায় কাউকে আমি হাত দিতে দেব না। বুদ্ধি দিতে এসেছেন আমার কি করা উচিত—হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে আপনার স্পর্ধা আছে।'

'আপনি আসলে তিনকন্যার রাজকন্যা হয়ে থাকতে চাইছেন।' রেগে গেছে হাসান। খানিকটা নিজের ওপরও। পুরোপুরি ব্যর্থ হতে চলেছে ও, আশার কোন আলোই দেখতে পাচ্ছে না। তবু সুর নরম করে বলে গেল, 'আনন্দময় একটা জগতে বেরিয়ে আসার জন্যে আপনার জন্যে একটা দরজা খুলে দিয়েছি আমি। এখন আপনার ইচ্ছে। স্বীকার করি, তিনকন্যায় এক ধরনের শান্তি আছে, নির্জনতাও আছে। কিন্তু শুধু এতেই মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। তার আরও অনেক কিছু দরকার। তিনকন্যার উন্নতি না হলে সে-সব কিছুই আপনি পাবেন না। একদিন আপনার বিয়ে হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্যে স্কুল দরকার হবে, অসুখ-বিসুখ ডাক্তার দরকার হবে। এ-সব

আপনি ভাববেন না?'

'আমার কিন্তু ধৈর্যে কুলাচ্ছে না,' বলল শিরিন। 'আপনি চলে গেলে খুশি হই। একবার না বলেছি, চিরকালই না বলব।'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। 'তবু অনুরোধ করব, চিন্তা করে দেখবেন, প্লীজ। একবার না বলে পরে হ্যাঁ বললে সম্মান ক্ষুণ্ন হয়, এ-কথা ঠিক নয়।'

'আমি সম্মান-অসম্মানের কথা ভাবছি না। কি ভাবছি, তা-ও আপনাকে জানাবার প্রয়োজন দেখছি না।'

'আপনি যেভাবে কথা বলছেন, এভাবে সম্ভবত সামন্ত যুগের রাজার মেয়েরা কথা বলত। আপনি কোন যুক্তি মানছেন না।'

'তিনকন্যা আমাদের। আমরা এখানে কোন হৈ-হাঙ্গামা বা ঝামেলা আমদানি করতে রাজি নই। এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি হতে পারে?' হাসানের রাগ দেখে হাসছে শিরিন।

'তাহলে শুধু নিজের কথাই ভাববেন? ওদের কারও কথা ভাববেন না।'

'কোন তাগাদা বা তাড়া অনুভব করছি না,' বলল শিরিন। 'এক সময় হয়তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাব। সে আশায় থাকলে ঠকতে হবে আপনাকে।'

'সত্যি হতাশ হলাম,' বলল হাসান। 'ভেবেছিলাম আপনাকে আমি ঠিকই রাজি করতে পারব।'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল শিরিন। 'জেটিতে নেমে মান্না কাকুকে বলুন, সে আপনাকে কক্সবাজারে পৌঁছে দেবে।'

'আমার ইচ্ছে ছিল শ্বেতবসনার পিছনের জঙ্গলটা একটু ঘুরে দেখব।'

শিরিন বলতে যাচ্ছিল, আমার অনুমতি নেই। কিন্তু এক সেকেণ্ড

ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'আজ নয়। অন্য একদিন।'

'কি জানেন, তিনকন্যাকে যতই দেখি, সাধ মেটে না।'

'এরকম জায়গা বাংলাদেশে আরও নিশ্চয়ই অনেক আছে,' বলল শিরিন, 'এটার পিছনে সময় নষ্ট না করে সেরকম একটা খুঁজে নিলেই তো পারেন।'

'তা হয়তো আছে। কিন্তু পছন্দের একটা ব্যাপার আছে না? তিনকন্যাকে অসম্ভব ভাল লেগে গেছে আমার। বলতে পারেন, আমি জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেছি।' এবং আপনারও, মনে মনে বলল হাসান।

'আপনাকে হতাশ করতে হচ্ছে বলে সত্যি দুঃখিত,' একটু নরম সুরে বলল শিরিন।

'সত্যি আমার কোন আশা নেই?'

'না।' ম্লান হাসল শিরিন। 'তবে এখানে বেড়াতে ইচ্ছে হলে আসবেন, কেউ আপনাকে মানা করবে না।'

'ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি। আজ তাহলে আসি, কেমন?'

হাত পাতল শিরিন। 'চিঠিটা।'

মুখ শুকিয়ে গেল হাসানের। 'আপনি ভুলে গেছেন ভেবে স্বস্তিবোধ করছিলাম। আসলে কি জানেন, মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। চিঠিটা আমি আসার সময় ভুলে হোটেলে ফেলে এসেছি।'

হাতটা নামিয়ে নিল শিরিন। 'নাকি তারিন আপনার হাতে কোন চিঠি দেয়ইনি?'

'কি বলছেন! অবশ্যই দিয়েছেন। কালই আমি ওটা এনে দেব আপনাকে...।'

'আপনাকে কেন আনতে হবে? মান্না কাকুর হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

'না, আমি নিজেই নিয়ে আসব,' বলল হাসান। 'আপনার অনুমতি

যখন পেয়েছি, বেড়ানোর সুযোগটা হাতছাড়া করি কেন। একটা কথা···বলতে সাহস হয় না, তবু বলি—অন্য কোন অর্থ করবেন না, প্লীজ।'

'অনেক কথাই তো শুনতে হলো। এটাও বলুন।'

'আমার না খুব শখ একটা রাত শ্বেতবসনায় কাটাই,' ভয়ে ভয়ে, দু'বার ঢোক গিলে কথাটা বলেই ফেলল হার্সান।

তিনকন্যায় একা থাকে শিরিন, এ-ধরনের প্রস্তাব শুনে তার অপমান বোধ করার কথা। তবে তাকে রাগতে দেখা গেল না। বরং হেসে উঠল সে, বলল, 'এতই যখন শখ, একটা রাত না হয় কাটালেন শ্বেতবসনায়। আমি আমার কোন বান্ধবীর বাড়িতে থাকব। তবে এক শর্তে—ব্যবসার কথাটা তুলতে পারবেন না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি আমি···।'

হাত তুলে থামিয়ে দিল শিরিন। 'থাক। তবে কাল নয়, সোমবারে আসুন। সেক্ষেত্রে তারিনের চিঠিটা আজই মান্না কাকুকে দেবেন, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' বিদায় নিয়ে চলে গেল তারিক হাসান।

ছয়

তারিনের চিঠিটা দু'দিন পর চোছিনের হাতে তিনকন্যায় পাঠাল মান্না শেখ, সঙ্গে মৃদুলের একটা চিঠিও। বেলা বারোটার দিকে শ্বেতবসনায় উঠে শিরিনকে পেল না চোছিন। চান্দা জানাল, লোভার কাছে গেছে

মাখন আনতে। চোছিন, চান্দা আর লোভা তিন ভাই-বোন; ওদের মা-বাবা মারা গেছেন। কেউই খুব একটা লেখাপড়া শেখেনি, তবে তিনজনই যে যার হাতের কাজে খুবই দক্ষ। ট্রলার ড্রাইভার হিসেবে চোছিনের নাম আছে—মাছ ধরার বড় ট্রলার নিয়ে প্রায়ই সে গভীর সাগরে চলে যায়। আর বোন দুটো আশ্চর্য সুন্দর সব পুতুল তৈরি করতে পারে। সওদাগর আলি হায়দার পরিবারটিকে একটা ছোট্ট খামার করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা থেকে কোনদিনই ভাল কিছু আয় হয়নি। দুধ, ডিম, বাছুর ইত্যাদি আরও অনেক বেশি উৎপাদন করা সম্ভব, কিন্তু নাগালের মধ্যে ক্রেতা না থাকায় উৎসাহ পায় না ওরা। নিয়মিত পরিবহন ব্যবস্থাও তিনকন্যায় গড়ে ওঠেনি।

লোভা মাখন তৈরি করছে, গাছের ছায়ায় একটা মোড়ায় বসে তাই দেখছে শিরিন। তার মাখন নিতে আসাটা আসলে স্রেফ অজুহাত, জানতে এসেছে তিনকন্যার উন্নতির ব্যাপারে লোভা কি ভাবছে। কিন্তু কথাটা কিভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না। এই সময় চিঠিগুলো নিয়ে এল চোছিন। তারিনের চিঠি পেয়ে খুশি হলো শিরিন। দ্বিতীয় চিঠিটা দেখে ভাবল ছিঁড়ে ফেলবে। তবে রেখে দিল আপাতত, লোভা আর চোছিনের সামনে তো আর ছেঁড়া যায় না।

তারিনের চিঠির খাম খুলল সে। তারিন লিখেছে—

'তারিক হাসান সম্পর্কে সত্যি কথাটা লিখতে ভয় লাগছে আমার। তুই এমন একটা মেয়ে, কোন কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল এইটুকু বলি, ভদ্রলোক শুধু তিনকন্যার প্রেমে পড়েননি।'

'ওঁনার প্রস্তাবটা আমার কাছে ভারি রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়েছে। উন্নতি না হলে তিনকন্যার কিই বা মূল্য আছে, বল? আমি তো খুবই চাই তাঁর কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হোক। কিন্তু আমি একা চাইলেই তো হবে না, তোরও অনুমতি লাগবে। আশা করি সবদিক ভাল করে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিবি।'

'এখানে আমি খুব ভাল আছি। কমপিউটর যা শিখেছিলাম, একটা ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে সব আবার ঝালাই করে নিচ্ছি। তবে, দুঃখের কথা হলো, আমার মডেল হবার সাধ বোধহয় পূরণ হবার নয়। ট্রেনার ভদ্রমহিলা বলছেন, আমি নাকি হাতির মত হাঁটি, শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে পারি না, চুলের অবস্থাও নাকি জঘন্য। এরকম আরও অনেক তিক্ত মন্তব্য শুনতে হয়েছে। কিন্তু টাকা দিয়ে এ-সব কেন শুনতে যাব আমি? মডেলিং শেখাবে, তা না, ওরা আমার আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দিচ্ছিল। এক হপ্তা ক্লাস করার পর আর যাচ্ছি না। তবে ঢাকায় এসে খুব ভাল করেছি আমি, আমার চোখ খুলে গেছে। তুই ভাল আছিস তো···?'

আরও অনেক কথা লিখেছে তারিন, সবটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারল না শিরিন। ভদ্রলোক শুধু তিনকন্যার প্রেমে পড়েননি, তারিনের এ-কথার মানে কি? তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আগামী হপ্তায় তিনকন্যায় তাঁকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুলই করেছে সে। শুধু আসতে বলেনি, শ্বেতবসনায় রাত কাটাবারও অনুমতি দিয়েছে। চিঠিটা আগে পেলে অবশ্যই সে রাজি হত না।

ভালবাসা? আবার? শিরিনের ইচ্ছে হলো খিলখিল করে হেসে ওঠে। একবার প্রতারিত হওয়াই কি যথেষ্ট নয়? তার কি জীবনের মত শিক্ষা হয়ে যায়নি?

তারিক হাসান আসতে চাইছেন, আসুন। যত চেষ্টাই করুন তিনি, তাঁর আশা ও স্বপ্ন কোনদিনই পূরণ হতে দেবে না শিরিন। তার কপালে না আছে তিনকন্যা, না অন্য কিছু। বরং তাকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে শিরিন। তাকে নিয়ে মানুষ খেলে, এবার সে-ও মানুষকে নিয়ে একটু খেলুক না। এবার এলে তারিক হাসানকে আভাসে খানিকটা আশা দেবে শিরিন, ভাবতে দেবে লেগে থাকলে তাঁর অন্তত তিনকন্যা পাবার সম্ভাবনা আছে। তারপর না খেলা জমবে।

শিরিনের মনে হলো, হাতে ভাল একটা কাজ পাওয়া গেছে।

ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে চাইছে সে। তারপর ভাবল, মৃদুল তাকে নিয়ে কি জঘন্য খেলাটাই না খেলল, সে-ও ওকে নিয়ে একটু খেললে কেমন হয়? এতদিন শুধু মৃদুলই চিঠি লিখছে, এবার সে-ও দু'একটা লিখুক না।

'ওলো, ওই সখী,' লোভাকে বলল শিরিন, 'ট্যুরিস্ট সেন্টার সম্পর্কে শুনলি কিছু? ঢাকা থেকে এক বাবু এসেছিল, তাঁর কথা কিছু বল আমাকে।'

হাতের কাজ থামিয়ে হেসে উঠল লোভা। 'বলতে লজ্জা পাই লো, সই। বাবু তো কতবছর ধরেই আসা-যাওয়া করছেন। কিন্তু তিনি তো আমাদের কাছে আসছেন তোমার তত্ত্ব-তালাশ নিতে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি!' হেসে উঠল শিরিনও। 'তা কি বলেন রে?'

'বলেন রাজ্য চাই তাঁর, রাজ্যের সঙ্গে আরও চাই রাজ কন্যা।'

'তোরা খুব উৎসাহ দিস তাঁকে?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল শিরিন।

'দিই, তবে ভয়ও দেখাই। বলি, রাজকন্যের মনে বিশাল এক দুঃখ আছে। আঘাত পেয়ে রাজকন্যা এখন হৃদয়হীনা, পাষাণী। তার মুখে হাসি ফোটাতে পারা সহজ কাজ নয়।'

'তোদেরকে লোভ দেখান না?'

'দেখান না আবার! বলেন এই জায়গার উন্নতি হলে আমাদের সবার জীবনযাপন বদলে যাবে। চোছিনকে সাত হাজার টাকা বেতনে চাকরি দিতে চেয়েছেন। বলেছেন, চোছিন বিয়ে করলে তার বউয়েরও চাকরি দেবেন।'

'চোছিন বিয়ে করবে বুঝি?'

গালে হাত দিল লোভা। 'ও সই, তুমি জানো না? ভাই তো আমার দশ বছর ধরে অমরাবতীর সঙ্গে পিরিত করছে।'

'অমরাবতী? কে সে?'

'উয়ো প্রো চাকমার মেয়ে। থাকে সেই লামার ওদিকে এক পাহাড়ে।'

'দশ বছর ধরে প্রেম করছে?' শিরিন অবাক। 'বিয়ে করছে না কেন?'

'অমরাবতী তিনকন্যায় আসতে চায় না। বলে, শহর ছাড়া সে থাকতে পারবে না।'

হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল শিরিনের। লোভাকে বলল, 'আজ আসি রে। মাখন তৈরি হলে তুই দিয়ে আসিস।' জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফেরার পথে মাথা নিচু করে হাঁটছে সে। বোঝা গেল, চাকমাদের গোটা একটা পরিবার তিনকন্যার উন্নতি চায়। অর্থাৎ তারিক হাসান ওদের সমর্থন আদায় করেছেন। হয়তো বাকি পরিবারগুলো সম্পর্কেও কথাটা সত্যি।

কিন্তু তাতেই বা কি। তিনকন্যা তো ওদের নয়। সে যদি রাজি না হয়, কারও কিছু করার নেই। শ্বেতবসনায় ফিরেই মৃদুলের চিঠিটা খুলল সে। মৃদুল লিখেছে—

'আমি জানি আমার চিঠির কোন উত্তর তুমি দেবে না। এ-ও জানি রূপে-গুণে অসামান্য যে মেয়েটি আমাকে ভালবেসেছিল, সে আজ আমাকে ঘৃণা করে। তোমার সঙ্গে আমি একমত, শিরিন; সত্যি আমি বেঈমান, তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রতারণা করেছি। ঘৃণাই যখন করো, জানতে ইচ্ছে করে না সেই গুরুতর অপরাধের কি শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে? শুনে তুমি খুশি হবে, এই আশায় আমার দুর্দশার কথা তোমাকে বিস্তারিত জানাতে চাই। খানিকটা পাপমোচন তাতে হলেও হতে পারে।

'তোমার ছবি রাখি সঙ্গে। শায়লা দেখে। তাকে শোনাবার জন্যে সব সময় তোমার প্রশংসা করি। ঠিক কি ধরনের ভালবাসা ছিল আমাদের, সব আমি ব্যাখ্যা করে বলেছি তাকে, কিছুই গোপন করিনি।

অনেক আগেই সে বুঝে ফেলেছে, তার ওপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছি আমি। কিন্তু সে খুব কঠিন মেয়ে, ভেঙে পড়েনি; বরং প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আরও কঠিন হয়েছে। শুনবে তার প্রতিশোধের কথা? অবশ্য প্রথমে তার নোংরা স্বভাবের কথা জানানো দরকার।

'রাত-দিন যেভাবে শায়লার মুখ চলে, আর দু'একমাসের মধ্যে তার ওজন আড়াই মোনে দাঁড়াবে। কোন মেয়ে হপ্তায় এক দিন গোসল করে, তা-ও অনেক করে বলার পর, এ-কথা তুমি বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করো আর নাই করো, এ-ও নির্জলা সত্যি যে ভূতের ভয়ে সারারাত আমাকে ঘুমাতে দেয় না সে, জাগিয়ে বসিয়ে রাখে। এ এক অদ্ভুত পরিবারে বিয়ে করেছি আমি, শায়লা বোন-প্লেট ব্যবহার করে না—মাংসের হাড় বা মাছের কাঁটা প্লেটের কিনারায় পাশাপাশি সাজিয়ে রাখে। কত বুঝিয়েছি, কাজ হয়নি। প্লেটে হাত ধোবে, তোয়ালেতে হাত না মুছে ওড়না বা শাড়ির আঁচলে মুছবে, মোছার আগে হাত ঝাপটে আশপাশের সবার মুখে পানির ছিটা দেবে, সবার সামনে গাল হাঁ করে দাঁত পরিষ্কার করবে। তাসমিনার স্বামী, তার ভাই মোবিন সম্পর্কে যখনই কোন কথা উঠবে, মন্তব্য করবে, "ওটা একটা বোদাই।" এই হলো তার ভাষার নমুনা।

'এবার তার প্রতিশোধ সম্পর্কে বলি তোমাকে। একদিন সে হাসতে হাসতে বলল, "তোমার জীবনে যেমন একটা প্রেম ছিল, তেমনি আমার জীবনেও একটা বিয়ে ছিল।" শুনে আমি তো হতভম্ব। কিন্তু শায়লা হাসতে লাগল। তার ভাষায়, "অত্যাচার করত বলে তার মুখে পেশাব করে দিয়ে চলে এসেছি।" সে আমাকে আরও শুনিয়ে দিয়েছে, আমিও যদি তার ওপর অত্যাচার করি তাহলে ওই একই কাণ্ড ঘটিয়ে আমার কাছ থেকে চলে যাবে সে। তবে তার আগে প্রতিশোধ নেবে ভাইকে দিয়ে তাসমিনাকে ভুগিয়ে।

'কত কথা শোনাব তোমাকে। শায়লার সবচেয়ে খারাপ স্বভাব

হলো···।

রুচিতে বাধছে শিরিনের, আর পড়তে ইচ্ছে করল না। জবাব দেবে কি, ঘৃণায় রী রী করছে শরীর। তবে সে ঘৃণা মৃদুলের ওপর, নাকি শায়লার ওপর, নিজেও সঠিক বলতে পারবে না। খানিক আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিল শিরিন। মৃদুলের চিঠির জবাব কোনদিনই দেবে না সে। আর কত, এবার সত্যি সত্যি ওর কথা তাকে ভুলে যেতে হবে। ইদানীং মাঝে মধ্যে একটা কথা উঁকি দেয় তার মনে, মৃদুলকে সে কি ঠিকমত চিনতে পেরেছিল? ওদের প্রেমটা সার্থক হলে, অর্থাৎ মৃদুলের সঙ্গে তার বিয়ে হলে, সে কি সুখী হত?

আবার সেই সোমবার ভোরেই তিনকন্যায় হাজির হলো হাসান। হাঁটতে বেরিয়ে শ্বেতবসনায় আর ফেরেনি শিরিন, জেটিতে দাঁড়িয়ে রাজহংসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হাসানকে দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে নামতে দেখে মনে মনে অবাক হলো সে। মাত্র এক রাত থাকার কথা, দুটো সুটকেস নিয়ে আসার কি দরকার? ভাব দেখে মনে হবে বিদেশ থেকে যেন নিজের বাড়িতে ফিরলেন। তবে হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানাল শিরিন। 'ভাল তো?'

হাসল হাসানও, বলল, 'ভাল ছিলাম না, থাকার কথাও নয়। তবে তিনকন্যায় আবার পা দিয়েছি, আপনাকেও আবার দেখতে পাচ্ছি, তাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত আশা করি আমার ভাল থাকায় কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

শর্তটার কথা মনে করিয়ে দিল শিরিন। 'লীজ, পর্যটন কেন্দ্র, ব্যবসা—এ-সব বিষয়ে আলোচনা করা নিষেধ, মনে আছে আপনার?'

'জ্বী, মনে আছে।'

'তাহলে চলুন, শ্বেতবসনায় আপনার নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে চান্দা। ভোর অন্ধকার থাকতে বেরিয়েছেন, আপনার নিশ্চয়ই খিদে

পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে মানে? আমি রীতিমত দুর্ভিক্ষের শিকার।'

হাসানের বলার ভঙ্গি লক্ষ করে হেসে উঠল শিরিন, হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল কালো চেহারা নিয়ে মান্না শেখ সামনে এসে দাঁড়াতে। 'কি হয়েছে, মান্না কাকু?' শিরিন উদ্বিগ্ন।

মান্না শেখ নয়, দ্রুত কথা বলে উঠল হাসান। 'কাকুর মন খুব খারাপ, বুঝলেন। ইঞ্জিন গোলমাল করছে, মেরামত করতে ছ'হাজার টাকা লাগবে। ভাড়া খাটিয়ে যা আয় হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে কাকুর, কখনোই কিছু জমাতে পারেন না। এখন মেরামতের টাকা উনি পাবেন কোথায়?'

'পাবে কোথায় মানে? মেরামতের দরকার হলে চিরকালই তো আমরা টাকা দিই।' মনে মনে রাগ হচ্ছে শিরিনের।

'সেটাই তো কাকুর সমস্যা। আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিতে তাঁর খারাপ লাগে, অথচ নিজেও যোগাড় করতে পারেন না।'

'এ ব্যাপারে আপনি মাথা না ঘামালেও পারেন,' নিচু গলায় বলল শিরিন। 'কাকু, কাল যাবার সময় চেকটা চেয়ে নিয়ে যেয়ো। ছ'হাজারই তো?'

'জ্বী, মা জননী।'

পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠার সময় নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। এক সময় শিরিন জানতে চাইল, 'সুটকেসগুলো বেশ ভারি মনে হচ্ছে। দুটোই বা কেন?'

'একটা আপনার বোন গছিয়েছেন আমাকে,' জবাব দিল হাসান। 'আপনার জন্যে লেটেস্ট ডিজাইনের একগাদা ড্রেস পাঠিয়েছেন উনি। দ্বিতীয় সুটকেসটা আমার—তবে ওতেও আপনাদের জন্যে কিছু কিছু জিনিস আছে।'

'তারিনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' আনন্দে চিৎকার করে

উঠল শিরিন। 'তারমানে আপনি ঢাকা থেকে আসছেন? কেমন আছে ও? কোন চিঠি দিয়েছে?'

মাথা নাড়ল হাসান। একটু থেমে সুটকেস দুটো নামাল, চড়াই বেয়ে উঠতে হচ্ছে বলে হাঁপিয়ে গেছে বেচারা।

ব্যাপারটা লক্ষ করে শিরিন বলল, 'দিন, একটা সুটকেস আমাকে দিন।'

মাথা নাড়ল হাসান। 'আমিই পারব,' বলে আবার সুটকেস দুটো দু'হাতে নিয়ে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। 'এরকম পরিশ্রমের কাজ মেয়েদেরকে দিয়ে করানো উচিত নয়।'

'মানুষ হিসেবে আপনি খুবই বিবেচক,' হাসিমুখে একটু ব্যঙ্গ করল শিরিন। 'তা তারিনের সঙ্গে কি কি কথা হলো আপনার?'

'ব্যবসার কথা তোলা নিষেধ আছে, কাজেই মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছি,' জবাব দিল হাসান।

'তাহলে থাক,' বলল শিরিন। 'কি যেন বলছিলেন? দ্বিতীয় সুটকেস-টায় কি আছে?'

'আপনার জন্যে কিছু চকলেট আর মিষ্টি নিয়ে এসেছি।'

'তাই তো, খালি হাতে আসেন কিভাবে! কিন্তু মিষ্টি দিয়ে কি আর ভোলাতে পারবেন আমাকে!'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল হাসান। বলল, 'আর ওদের জন্যেও দু'একটা জিনিস এনেছি।'

'ওদের জন্যে?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসানের দিকে তাকাল শিরিন। 'ওদের জন্যে মানে?'

'বিদেশী কিছু উপকরণ, পুতুল তৈরির কাজে লাগে,' বলল হাসান। 'আর এনেছি কয়েকটা ক্যাটালগ। ওদের হাত তো খুবই পাকা, ক্যাটালগ দেখে পুতুল বানালে বিদেশীরা লাইন দিয়ে কিনতে আসবে।'

'চান্দা আর লোভার জন্যে?'

'এখানে যারা পুতুল বানায় তাদের সবার জন্যে,' বলল হাসান। 'শুনেছি আপনিও তো বানান।'

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে বসল হাসান। আজ ওর সঙ্গে শিরিন বসল না, বসল না ইচ্ছে করেই, বলল গোসল না করে কিছু খাবে না সে। কারও সঙ্গে ঘন ঘন খেতে বসলে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সেটা ঘটতে দিতে চাইছে না সে। তবে ভদ্রতার খাতিরে ডাইনিং টেবিলে উপস্থিত থাকল। হাসানকে নাস্তা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেছে চান্দা, খানিক পর সেদিক থেকে আদিবাসি একটা গানের সুর ভেসে এল। খাওয়া বন্ধ করে কান পেতে রয়েছে হাসান। এক সময় শিরিনের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কে গায়?'

'চান্দা। ওর গলা সত্যি খুব ভাল।'

'ভাল মানে? এত সুন্দর গলা কবে শুনেছি মনে করতে পারছি না। চর্চা ছাড়াই এরকম গাইতে পারে? কোন অনুষ্ঠানে যায় না?'

শিরিন হাসছে না। 'চান্দার চেয়ে লোভার গলা আরও ভাল। না, ওরা কোন অনুষ্ঠানে গায় না। শুধু শ্বেতবসনায় প্রতি হপ্তায় গায়, আর নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। চর্চা···চর্চা করে বৈকি। আমাদের এখানে হারমোনিয়াম, গিটার, তবলা, যা যা লাগে সবই আছে। আমিই ওদেরকে শিখিয়েছি।'

'এই গলা তো তিনকন্যার একটা অ্যাসেট, বিরাট সম্পদ! আপনি বলছেন ওর বোনের গলা আরও ভাল? ওরা আপনার কাছে শিখেছে? ওহ্ গড, তাহলে তো আপনার গান না শোনা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই!'

'এরপর বলবেন, ওদেরকে দিয়ে গান গাইয়ে বিপুল পরিমাণে ফরেন কারেন্সি আয় করা যায়।'

'সত্যি যায়! বিশ্বাস করুন, আদিবাসীদের এই গান শোনার জন্যে বিদেশী পর্যটকরা পাগল হয়ে ছুটে আসবে···।'

'আপনি শর্তের কথা ভুলে যাচ্ছেন,' মনে করিয়ে দিল শিরিন।

'প্রসঙ্গটা আপনি তুললেন, না আমি?' হাসানের আবেগ উথলে উঠতে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে দমন করল সেটাকে।

চান্দাকে ডাকল শিরিন, হাসানকে আরেক কাপ চা দিতে বলে দোতলায় উঠে এসে গোসল করল। তার আজ গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কারণটা কি? হাসানকে শোনাতে চায়? তার মনে পড়ল, মৃদুল কোনদিন তার গান শুনতে চায়নি। হাসানের সঙ্গে ক'দিনেরই বা পরিচয়, অথচ কি রকম আগ্রহ দেখাল—বলছে, আমার গান না শোনা পর্যন্ত তার নাকি শান্তি নেই।

নাস্তা সেরে নিচে নেমে এল শিরিন। একটা র‍্যাক থেকে দুটো ছড়ি নামাল সে, একটা বাড়িয়ে দিল হাসানের দিকে। 'এটা রাখুন, ঢাল বেয়ে নামার সময় দরকার হতে পারে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল হাসান।

'বারে, আপনিই তো ঘুরেফিরে তিনকন্যা দেখেতে চেয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ, তা চেয়েছিলাম। তবে বেশির ভাগই আমার দেখা আছে। ভাবছিলাম সুযোগ যখন পেয়েছি, আপনার সঙ্গে গল্প করে সময়টা কাটাই।' খানিক ইতস্তত করল হাসান, তারপর আবার বলল, 'ভাবছিলাম আপনার বোন এত শখ কোরে পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে বেরুবেন আপনি নতুন এক সেট ড্রেস পরে।'

'বেড়াতে বেড়াতে গল্প করবেন,' বলল শিরিন। 'আপনার কথা শুনতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমার কথা বেশি কিছু জানতে চাইবেন না, প্লীজ। তারিনের পাঠানো ড্রেস?' হেসে উঠল সে। 'লেটেস্ট ফ্যাশনের এ-সব ড্রেস পরে নির্লজ্জ হতে আমার বাধে। ওর ড্রেস ওই পরবে।'

'তবে শুনতে না চাইলেও অনেক কথা কানে আসে।'

স্থির হয়ে গেল শিরিন। 'কি শুনেছেন আপনি আমার সম্পর্কে?'

'আপনার এরকম অগ্নিমূর্তি আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়,' বিড়বিড়

করল হাসান। 'যাই শুনে থাকি, জানবেন আপনার ব্যথায় আমিও ব্যথিত।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে শিরিন বলল, 'কারও সহানুভূতি দরকার নেই আমার।'

শ্বেতবসনা থেকে বেরিয়ে এসে একটা সমতল মাঠ পেরুল ওরা, এসে দাঁড়াল দীর্ঘ ঢালের কিনারায়। 'এটা মাঝখানের পাহাড়,' হাসানকে বলল শিরিন। 'নাম আইরিন। আইরিন আমার ছোট বোন। গতমাসে লণ্ডনে বিয়ে করেছে সে।'

'সেই সবার ছোট, আমি জানি,' বলল হাসান। 'অথচ সেই আগে বিয়ে করল।' হাসছে।

ঢাল বেয়ে নামার সময় শিরিন বলল, 'এখান থেকে নেমে পাশের যে পাহাড়টায় চড়ব সেটার নাম শিরিন। বোনেদের মধ্যে আমি বড়, ওই পাহাড়টাও তাই। পিছন দিকে ওটা দেড় মাইলের মত লম্বা। ওদিকে আধ মাইল হাঁটলে চান্দাদের খামার। চলুন ওদিকেই যাওয়া যাক, কি বলেন?'

শিরিনে উঠে এসে কিনারা ধরে হাঁটছে ওরা। পাশাপাশি পাহাড়ের সংখ্যা তিনটে হলেও, ওগুলোর মাথায় আরও অনেকগুলো চূড়া আছে, সেগুলোর মাঝখানে ছোট বড় নানা আকৃতির খুদে উপত্যকা। আবার মাঝারি আকারের দু'একটা মালভূমিও দেখতে পাওয়া গেল। সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে হাসান। ক্যাম্প ফায়ারের জন্যে আদর্শ জায়গা হতে পারে এ-সব। মালভূমির সঙ্গে উপত্যকার দূরত্ব মনে মনে মাপজোক করছে ও। দূরত্ব অতিক্রমের জন্যে ট্রলি কার-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর হবে ব্যাপারটা। 'আপনি কি বলেন, এখানে যদি ট্রলি কার থাকে...?'

'না।'

তবু হতাশ হবার পাত্র নয় হাসান, সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, 'এদিকে সুপেয় পানি কিভাবে পান আপনারা?'

'ঝর্ণা আছে কয়েকটা,' বলল শিরিন। 'একটা ঝর্ণা থেকে মিনারেল ওয়াটার বেরোয়।'

'মিনারেল ওয়াটার? কি বলছেন!' উত্তেজিত হয়ে উঠল হাসান। 'কিভাবে জানলেন মিনারেল ওয়াটার?'

'পানির নমুনা ঢাকায় পাঠিয়ে আব্বু একবার পরীক্ষা করিয়েছিলেন। রেজাল্টে বলা হয়, ওই ঝর্ণার পানিতে নির্দিষ্ট কিছু মিনারেল সল্ট আছে।'

হাসানের জানতে ইচ্ছে করল, রেজাল্টটা লিখিত দেয়া হয় কিনা, তবে প্রশ্ন করতে সাহস হলো না। তবে বলল, 'সুযোগ পেলে আমি নিজে একবার পরীক্ষা করাতাম।'

'সে সুযোগ কেউ আপনাকে দেবে না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল শিরিন। 'এ-সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলুন। আপনার সম্পর্কে কিছুই তো জানা হলো না। কে আপনি? কি আপনি?'

'কি বলব। উল্লেখযোগ্য কিছু নই। আম্মা মারা যাবার পর আব্বা আমার খালাকে বিয়ে করেন। আমার ওই সৎ মা (কাগজে খবর হয়েছিল।) তার ঘরে একটা ছেলে হবার পর—আমার তখন তেরো বছর বয়েস, আব্বুর একমাত্র সন্তান—ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় আমাকে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হলে ভাগ্যগুণে বেঁচে যাই। হাসপাতালে সাংবাদিকরা ভিড় করে, আমি তাদেরকে সত্যি কথাই বলি। সৎ মাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু বিচারে রায় হয় বেকসুর খালাস। বলা হলো, ভুল করে আমিই ট্যাবলেটগুলো খেয়ে ফেলেছিলাম। আব্বুও আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তবে একটু সন্দেহ নিশ্চয়ই হয়েছিল, তা না হলে আমাকে জাপানে আমার মামার কাছে পাঠাতেন না। ওখানে লেখাপড়া শিখি আমি। আব্বু মারা যাবার পর বেশ কিছু সম্পত্তি আর নগদ টাকা পাই। প্রত্যেক বছর দেশে ফিরতাম, ভাষা আর সংস্কৃতির চর্চাটা তাই চালিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি।'

'দেখা যাচ্ছে আমার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে আপনার। আপনিও

বাবা-মার স্নেহ থেকে বাঞ্চিত।'

'আপনার জন্যে আমার সহানুভূতি হয়,' ফিসফিস করল হাসান।

আড়ষ্ট হলো শিরিন। 'একবার তো বলেছি, কারও সহানুভূতি আমার দরকার নেই।'

'আমার দরকার আছে,' বিড়বিড় করল হাসান। 'আমি ইস্পাতে গড়া মানুষ নই।'

'পুরুষমানুষের মুখে এ-কথা মানায় না,' মন্তব্য করল শিরিন।

'কঠিন বাস্তব দুনিয়ায় সম্পূর্ণ ফিট আমি,' জবাব দিল হাসান। 'যে-কোন চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু স্নেহ-ভালবাসার কথা যদি বলেন, চির কাঙাল আমি। কেউ একটু আদর করলে যেন মনে হয় স্বর্গ পেয়ে গেলাম। কিন্তু নিয়তি আমার ওপর সাংঘাতিক নিষ্ঠুর।'

'কেন, এ-কথা কেন বলছেন?'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা মালভূমির ওপর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজল হাসান। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিরিনের দিকে ফিরল ও। 'একটু ভালবাসার পাবার জন্যে যখনই যার দিকে হাত বাড়িয়েছি, আঘাত পেতে হয়েছে আমাকে। আব্বার সঙ্গে বিয়ের আগে ওই খালা আমাকে কত আদর করত। আমি তার আদর পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর যেই তার ছেলে হলো, সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে ভেবে আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। সেই থেকে আব্বুকেও হারালাম। আরও ঘটনা আছে, শুনতে আপনার ভাল লাগবে না।'

'তবু বলুন, আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

'মামাতো বোনটি ছিল আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। সেই প্রথম ভালবাসার কথা বলল আমাকে। তখন লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসা শুরু করেছি আমি। তার আগ্রহ দেখে আমিও একটু একটু করে ঝুঁকছি। তারপর এমন হলো, সারাক্ষণ তাকে চোখের সামনে পেতে ইচ্ছে করে। একদিন···।'

'থামলেন কেন?'

'আপনার না শোনাই ভাল।'

'না, বলুন।'

'একদিন বাড়ি ফিরে দেখি তার ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে পুরুষমানুষের হাসির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মামা তখন দেশে। দরজা খুলে দিয়েছিল ফিলিপিন মেইড সারভেন্ট। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে তার ঘরের দরজায় নক করি আমি। আমাকে মেইড সারভেন্ট মনে করে দরজা খুলে দেয় এক লোক। লোকটা মামার কর্মচারী, মধ্যবয়স্ক। তার পরনে শুধু আণ্ডারঅয়্যার দেখতে পাই। তাকে ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি চলে যায় ঘরের ভেতর। খাটের ওপর দেখতে পাই মামাতো বোনকে। পরনে প্রায় কিছুই ছিল না।'

'থাক, আমি আর শুনতে চাই না।' হাঁটতে শুরু করল শিরিন।

'আমি তো বলতেই চাইনি।'

'তাহলে এখনও আপনি জাপানে যান কেন?' জিজ্ঞেস করল শিরিন।

'যা-ই, কারণ জাপানে আমার ব্যবসা।'

'জিজ্ঞেস করাটা কি অভদ্রতা হয়ে যাবে—কি ব্যবসা?'

'বেশ বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে টোকিওতে। নারিতায় আছে ট্রাভেল এজেন্সি। ওখান থেকে আমার আরেকটা অফিস বাংলাদেশে রিকণ্ডিশন করা গাড়ি রফতানি করে।'

'এর মানে আপনি উল্লেখযোগ্য কিছু নন?'

'সত্যি নই। যদি অনুমতি দেন তো ব্যাখ্যা করি।'

'দিলাম।'

'আমার টাকা আছে। কিন্তু এই টাকা কি কাজে লাগবে, যদি নিজের একটা স্বপ্ন বা সাধ পূরণ করতে না পারি? একজনকে ভালবেসে যদি না পাই, টাকা বা জীবনটাকে নিয়ে কি করব আমি?'

'জানতে পারি, কে সে? আপনার মত সুদর্শন এবং ব্যবসা সফল এক তরুণকে প্রত্যাখ্যান করল?'

'প্রত্যাখ্যান করেনি। করবে, এই ভয়ে তাকে জানাতেই পারছি না।'

'তিনকন্যা আপনার কপালে নেই। এখন তাহলে কি করবেন?' জানতে চাইল শিরিন।

'জানি না। সত্যি জানি না কি করব। তবে তিনকন্যার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, একটা কথা বলি। সহজে হাল ছাড়ার পাত্র আমি নই।'

'আমিও তাহলে একটা কথা বলি। একবার না বললে কার সাধ্য আমাকে দিয়ে হ্যাঁ বলায়।'

পকেট থেকে সাদা একটা রুমাল বের করে বাতাসে দোলাল হাসান।

ভুরু কুঁচকে শিরিন জিজ্ঞেস করল, 'কি করছেন?'

'সাদা পতাকা ওড়াচ্ছি। আপাতত যুদ্ধবিরতির আবেদন জানাচ্ছি।'

'আপনার আবেদন সাড়া দিলাম। তবে এ শুধুই যুদ্ধবিরতি, শত্রুতার অবসান নয়, মনে রাখবেন।'

হাসান বলল, 'আপনি তখন জানতে চাইলেন, কে সে? অভয় দিলে উত্তরটা এখন দিতে চাই।'

ভয় পেল শিরিন। তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক। এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।'

'নাকি ভয় পাচ্ছেন?' হাসান হাসছে না। 'আমার ধারণা, আপনি জানেন কে সে।'

'আপনি কাকে ভালবাসেন আমি তা কি করে জানব,' শিরিনের গলায় ঝাঁঝ। 'তা জানার আমার কোন দরকারও নেই।'

'আপনি বলেছেন, তিনকন্যা পাব না। তারমানে কি সত্যি সত্যি তাকেও আমি পাব না?'

'জানি না কার কথা বলতে চাইছেন।' শিরিন হাসছে না। 'তবে আপনার নিয়তি বোধহয় সত্যি নিষ্ঠুর। তাকে পাওয়াও আপনার কপালে নেই বলেই আমার ধারণা।'

'পুনরাবৃত্তি হয়ে যায়, তবু বলি—আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব,

সহজে হাল ছাড়ব না।'

'আপনার পরাজয় দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখলাম আগাম সহানুভূতি।'

চান্দাদের খামারবাড়ি হয়ে কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত যেতেই দুপুর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খিদেও লেগেছে প্রচণ্ড। শিরিন বলল, 'তিনকন্যার সবটুকু দেখা একদিনে সম্ভব নয়, অন্তত তিন দিন লাগবে। আপনি তো কাল সকালেই ফিরে যাবেন, তাই না? তাহলে আবার আপনাকে আসতে হবে।'

'আমি কি বলেছি কাল সকালেই ফিরে যাব?' হেসে উঠল হাসান। 'ঠিক আছে, ইঙ্গিতটা আমি ধরতে পারছি। কাল সকালেই আপদ বিদায় হবে। তবে আবার আসতে বলায় অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার তো আর পা চলছে না, এদিকে খিদেতে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা।'

'শ্বেতবসনায় ফিরতে দেড়-দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। তার দরকারও নেই,' বলল শিরিন। 'লক্ষ করেননি, চান্দা আর লোভা কি রকম ব্যস্ত, আমাদেরকে শুধু চা খাইয়ে বিদায় করে দিল?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'শ্বেতবসনায় আপনাকে রাত কাটাবার অনুমতি দেয়া হলেও,' বলল শিরিন, 'আপনি আসলে ওদের মেহমান। আজকের দিনটার জন্যে আমিও তাই। দুপুরে এবং রাতে ওখানেই আমরা খাব। এতক্ষণ রান্নাবান্না শেষ, চলুন ফেরা যাক।' খাওয়াদাওয়ার এই আয়োজন শিরিনেরই সিদ্ধান্ত, হাসানকে সে বুঝিয়ে দিতে চায় দু'জনের মাঝখানে একটা দূরত্ব সব সময় থাকবে।

খাওয়াদাওয়ার পর খামারবাড়িতেই বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর আবার বেড়াতে বেরুল। এবার চান্দা আর লোভাকেও সঙ্গে নিল শিরিন।

একজোড়া মশাল আর দুটো টর্চ নিয়ে অপেক্ষা করছিল চোছিন ও চিরল, রাতে চান্দাদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর হাসানকে

শ্বেতবসনায় নিয়ে গেল তারা। ওর সঙ্গে তারাও ওখানে রাত কাটাবে।

পরদিন সকালে ফেরার কথা থাকলেও, ফিরতে দুপুর পার হয়ে গেল হাসানের। প্রতি মঙ্গলবার সকালে শ্বেতবসনায় নাচ-গানের আসর বসে। সেদিন বসল না, কারণ জানা গেল সৈকতে একটা ডলফিন উঠে এসেছে। হৈ-হৈ করতে করতে নেমে এল সবাই। দেখা গেল মস্ত বড় ডলফিনটা কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ডাঙায় উঠে আসার পর পানিতে নামতে চাইছে না। মান্না শেখ মন্তব্য করল, সে আসলে রোদ পোহাতে চাইছে, বিরক্ত না করাই ভাল। ট্রলারে চড়ে কিছু ছোট মাছ ধরল চোছিন, খেতে দেয়া হলো ডলফিনকে। কেউ কাছে গেলে চিকণ সুরে প্রতিবাদ জানায় সে। দেখা গেল একমাত্র শিরিনকেই সহ্য করতে পারছে, হাত দিয়ে ছুঁলেও কিছু বলছে না। মাছগুলো শিরিনই তাকে খাওয়াল। ডলফিনের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অনেকেই অনেক মন্তব্য করছে। শেষ পর্যন্ত শিরিনের চেষ্টাতেই আবার পানিতে ফিরে যেতে রাজি হলো সে। রাজহংসে চড়ে বিদায়ের সময় হাসান বলল, ডলফিন সাগরের প্রতিনিধি। তাকে আদর করে আপনি আসলে গোটা বঙ্গোপসাগরকে আদর করেছেন। আমি আমার সর্বস্ব বাজি ধরে বলতে পারি, আজ রাতে কোন ঝড় বা আলোড়ন উঠবে না, কারণ সাগর পুলকে অবশ হয়ে থাকবে। তিনকন্যাও আপনার স্পর্শ পেয়ে ধন্য···।'

হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠা মুখ গরম লাগছে, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল শিরিন, জেটি থেকে নেমে আসছে। নোঙর তখনও তোলা হয়নি, রাজহংসে হাসান একা। ওর চিৎকার ভেসে এল তার কানে। 'আমি সাগরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাই! তিনকন্যাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি!'

জেটি থেকে নেমে হন হন করে হাঁটছে শিরিন। হাসানের প্রবল উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা তাকে বিব্রত করে তুলেছে। পাহাড় থেকে নেমে এল মান্না শেখ, পাশ কাটাচ্ছে তাকে, হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। দুপুরে হাসানের খাওয়া হয়নি, চান্দা ওর খাবার পাঠিয়েছে, ফেরার পথে রাজহংসে বসে খাবে। দাঁড়িয়ে পড়ল শিরিন, মান্না শেখকে বলল,

'কাকু, উনি যদি আবার আসতে চান, শুধু সোমবার সকালে নিয়ে আসবে।'

সেই থেকে ব্যাপারটা নিয়মিত রুটিনে দাঁড়িয়ে গেল। প্রতি সোমবার সকালে তিনকন্যায় আসবেই হাসান। তবে রাতে থাকার কথা ওঠে না, সারাদিন বেড়িয়ে সন্ধের দিকে ফিরে যায়। এখনও আগের মতই কঠিন শিরিন, হাসান ব্যবসার কথা তুললেই, 'শুনতে চাই না,' বলে থামিয়ে দেয়।

এই রকম এক সোমবার দুপুরে ঢাল বেয়ে ওঠার সময় শিরিনের পা পিছলে গেল। গোড়ালিতে ব্যথা পেল সে, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। শ্বেতবসনা থেকে অনেক দূরে রয়েছে ওরা, আশপাশে কেউ নেই, চিৎকার করলেও কারও শুনতে পাবার কথা নয়। হাসান বলল, 'চিন্তা করবেন না, আপনাকে আগে বাড়িতে পৌঁছে দিই, তারপর কক্সবাজার থেকে ডাক্তার ডেকে আনছি।'

'বাড়িতে ফিরব কিভাবে?' কাতর গলায় বলল শিরিন। 'আমি তো হাঁটতেই পারব না।'

'আপনাকে আমি হাঁটতে দিলে তো।' পিছন ফিরল হাসান। 'কোন রকমে পিঠে সওয়ার হোন, দিব্যি পৌঁছে যাবেন বাড়িতে।'

'আপনার সাহস তো কম নয়!' রেগে বোম্ হয়ে গেল শিরিন। 'আমি আপনার কাঁধে চড়ব, এ-কথা আপনি ভাবতে পারলেন?'

মাথা চুলকাল হাসান। মুখে নার্ভাস হাসি। 'সত্যিই তো, তা কি করে হয়! দুঃখিত। তাহলে উপায়?'

অসহায় দেখাল শিরিনকে। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাল সে।

হাসান বলল, 'তাহলে এক কাজ করি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি লোভা বা চান্দাকে ডেকে আনি।'

'না!' ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল শিরিন। 'আপনার যেতে-আসতে এক ঘণ্টার ওপর লেগে যাবে, ততক্ষণ একা থাকতে হলে আতঙ্কেই মারা

যাব।'

'তাহলে আপনিই বলুন কি করা যায়।'

'আমাকে একটু ধরুন না, দেখি দাঁড়াতে পারি কিনা।'

হাসান সাহায্য করতে দাঁড়াতে পারল শিরিন, হাসানের গায়ে হেলান ও ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেও পারল। তবে এক ঘণ্টার পথ পেরুতে সাড়ে চার ঘণ্টা লেগে গেল। ডাক্তার ডাকতে হয়নি, পেইন কিলার ট্যাবলেট খেতে ব্যথাটা কমে গিয়েছিল, হারবাল মলম লাগাতে পরদিন ফোলাটাও আর ছিল না। রাত হয়ে যাওয়ায় হাসানের সেদিন কক্সবাজারে ফেরা হয়নি, লোভাদের বাড়িতে চোছিনের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল।

এই রকম আরেক সোমবারে এসে হাসান দেখল, তিনকন্যার সবাই শোকে পাথর হয়ে গেছে। তিন দিন আগে কক্সবাজারের লেটার বক্স থেকে কিছু চিঠিপত্র এনেছিল চোছিন, তার মধ্যে লণ্ডন থেকে পাঠানো একটা টেলিগ্রামও ছিল। ওগুলো মান্না শেখই চোছিনকে দিয়েছিল, তবে টেলিগ্রামে কি আছে তা তারও জানা হয়নি।

গত হপ্তায় সওদাগর আলি হায়দার হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। মেয়েরা ঢাকা থেকে বাপকে শেষ একবার দেখতে যেতে পারে, তাই তাঁর লাশ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। খবর পেয়েই ট্রলারে চড়ে কক্সবাজারে চলে গেছে শিরিন, সেখান থেকে ঢাকায়। সে ঢাকা থেকে লণ্ডনে চলে গেছে, নাকি তার আব্বার লাশ দেশে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিছুই হাসানের জানা হলো না।

তিনকন্যার সবাইকে চিরঋণী করে রেখে গেছেন আলি হায়দার, তাঁর মৃত্যুতে কান্নাকাটি করা খুবই স্বাভাবিক। শিরিন নেই, তবু ঘণ্টা দু'য়েক থেকে সবাইকে যতটা পারা যায় সান্ত্বনা দিল হাসান। ও শিরিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ঢাকায় যাবে শুনে মান্না শেখ বলল, সে-ও যেতে চায়। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

এক হপ্তা পর আলি হায়দারের লাশ নিয়ে আবার তিনকন্যায় ফিরল

সবাই। আইরিন সন্তানসম্ভবা, তাই সে আসতে পারেনি। শ্বেতবসনার পিছনের বাগানে সমাধিস্থ করা হলো তাঁকে। কবর খোঁড়া থেকে শুরু করে গোসল করানো, জানাজা পড়ানো, লাশ নামানো, প্রতিটি কাজে সাহায্য করল হাসান। ওদের কোন ভাই নেই, হাসান থাকায় সে অভাব খানিকটা পূরণ হলো। তারিন ও শিরিন শোকে এমনই কাতর, সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই ওর। পরিমিতি বোধ অনুমতি না দেয়ায়, পরবর্তী এক হপ্তা শ্বেতবসনায় প্রতিদিন পাঁচ মিনিটের বেশি থাকল না ও, যদিও এই এক হপ্তা তিনকন্যা ছেড়ে কোথাও গেল না।

চল্লিশার পর ঢাকায় ফিরে গেল তারিন। এখন আবার প্রতি সোমবারে তিনকন্যায় আসছে হাসান। শিরিনের সঙ্গে ওর দেখা হয়, তবে কথা হয় খুব কম। সব সময় মনমরা হয়ে থাকে শিরিন, শ্বেতবসনা ছেড়ে বড় একটা বেরোয় না। এভাবে তিন মাস পেরিয়ে গেল। তারপর একদিন শিরিন ওকে জানাল, 'জানেন, চোছিন তিনকন্যা ছেড়ে চলে গেছে।'

'সেকি! কেন?' হাসান অবাক।

'অমরাবতী নামে এক মেয়েকে ভালবাসে সে,' বলল শিরিন। 'মেয়েটা থাকে লামার ওদিকে এক পাহাড়ে। তাকে শহরে ঘর ভাড়া করে রাখতে হবে, এই শর্ত দেয়ায় এতদিন বিয়েটা হয়নি। চোছিন তাকে শেষবারের মত বোঝাতে গেছে। বলে গেছে অমরাবতী এখানে থাকতে রাজি হলে ফিরবে সে, তা না হলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। ভাইয়ের অপেক্ষায় ওরা দুই বোন অস্থির হয়ে আছে, শুনলাম সারাদিন শুধু কান্নাকাটি করছে।'

কি যেন চিন্তা করল হাসান, তারপর বলল, 'ব্যাপারটা আমি পছন্দ করতে পারছি না।'

'কি পছন্দ করতে পারছেন না?' শিরিন অবাক।

'শ্বেতবসনায় আপনার এই একা থাকাটা।'

হাসানের উদ্বেগ স্পর্শ করল শিরিনকে। তবে কৌতুক করার

সুযোগটা সে ছাড়ল না। 'আমার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, এমন কেউ তিনকন্যায় নেই। এক আপনি ছাড়া,' বলেই হেসে ফেলল সে।

অনেক দিন পর এই প্রথম শিরিনকে হাসতে দেখল হাসান। তবু না বলে পারল না, 'এ-কথা আপনি ভাবতে পারলেন, আপনার জন্যে আমি বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারি? সত্যি যদি তা ভাবেন, এখানে আর আমার আসা উচিত নয়।'

'না, সত্যি তা ভাবি না, এমনি ঠাট্টা করে বললাম।' শিরিনের মুখের হাসি হঠাৎ মুছে গেল। খানিক ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু ভাবছি, আপনি কিছু মনে করবেন কিনা।'

'কিছুই মনে করব না। বলে ফেলুন।'

'খুব গোপন কথা, একান্তই ব্যক্তিগত। তার আগে বলে রাখি, আমি চাই আপনি নিয়মিত এখানে আসা-যাওয়া করুন।'

'আমি কৃতজ্ঞ।'

'জানতে চাইবেন না, কেন চাই আপনি আসুন? জানেন, আমি একটা বিপদের আশঙ্কা করছি।'

'কি! বিপদ? আপনার? কি বিপদ? এই বললেন আমি ছাড়া আর কেউ আপনার বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে না···।'

'না, আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যি আমার ভয় লাগছে।'

এবার হাসানও সিরিয়াস হলো। 'কি ব্যাপার বলুন তো? সব আমাকে খুলে বলুন।'

ধীরে ধীরে শুরু করল শিরিন। কিভাবে তার সঙ্গে পরিচয় হলো মৃদুলের, কেমন ছেলে বলে মনে হয়েছিল ওকে তার, কতদিন ওরা প্রেম করল, কিছুই গোপন না করে সব বলে গেল। বরকনে বিনিময়ের মাধ্যমে শায়লাকে বিয়ে করল মৃদুল, সেই বিয়েতে শিরিনকেও যেতে হয়েছিল। ভেবেছিল, সম্পর্কটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা

হয়নি, মৃদুলই হতে দেয়নি। একদিকে স্ত্রীর ওপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে, আরেক দিকে প্রতি হপ্তায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখে দুঃখের কাঁদুনি গাইছে। ব্যাপারটা এক পর্যায় এমন অসহ্য হয়ে উঠল, ওর চিঠি পড়া ছেড়েই দিল শিরিন। কিন্তু অমন গভীরভাবে ভালবাসলে, খানিকটা মায়া মেয়েদের মনে থেকেই যায়, মনের মানুষটি নাগালের বাইরে চলে যাবার পরও। সেই মায়ার কারণেই চিঠিগুলো ফেলে দিতে পারেনি শিরিন, দেরাজে জমিয়ে রেখেছিল। রোজই মনে করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তা আর হয় না।

তারপর কয়েক দিন আগে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় সে,এবার সব ফেলে দেব। কিন্তু চিঠিগুলো বের করার পর দেখল শেষ যেটা এসেছে সেটা অন্যগুলোর চেয়ে একটু বেশি ভারি। কৌতূহল হলো, দেখি না কি লিখেছে।

মৃদুলের সেই শেষ চিঠিটা পড়েই ভয় পেয়ে গেছে শিরিন। ওর জীবনে, ওর বোন তাসমিনার জীবনে ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, সে-সব এতদিন কিছুই জানা হয়নি শিরিনের। শেষ চিঠিটা না পড়লে জানা হতও না।

মৃদুলের বোন তাসমিনা হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। বোন মারা যাওয়ায় শায়লার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে মৃদুল। বিনিময়ের বিয়ে ওদের, স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করলে বোনের ওপরও অত্যাচার হবে, এ-ধরনের একটা ভারসাম্যের ব্যবস্থা ছিল। তারপরও শায়লার ওপর অত্যাচার করেছে মৃদুল। এখন বোন মারা যাবার পর ভাবছে, শায়লাকে ডিভোর্স দেবে। শিরিন ওর চিঠির কোন জবাব না দিলেও, প্রতিটি চিঠিতেই উদ্ভট সব কথা লিখছে ও। তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার, এই সব কথাই শুধু থাকে চিঠিগুলোয়। শেষ চিঠিতে জানিয়েছে, শায়লাকে যে-কোন দিন ডিভোর্স দেবে সে, এবং তারপর তিনকন্যায় চলে আসবে। শিরিনের ভয়

পাবার সেটাই কারণ।

শিরিন আর মৃদুল সম্পর্কে অনেক কথাই জানে হাসান, তবে এতটা জানত না। গোটা ব্যাপারটা নোংরা এক চেহারা পেয়েছে, এটা সে পরিষ্কারই বুঝতে পারল। শিরিন যে এখন আর মৃদুলকে ভালবাসে না, এটাও স্পষ্ট। 'আমাকে কি করতে হবে বলে দিন,' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'কিছুই করতে হবে না,' তাড়াতাড়ি বলল শিরিন। 'যা করার আমিই করব। আমি শুধু চাই, মৃদুল যদি আমার যুক্তি না মানে, যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, তখন আমার পাশে আপনি যেন থাকেন।'

'আমি তো শুধু সোমবারে আসি। জানব কিভাবে তিনি কবে আসবেন?'

'মান্না কাকুকে আমার বলা আছে, সোমবার ছাড়া মৃদুলকে সে আনবে না।'

'ঠিক আছে, আগে সমস্যাটা সৃষ্টি হোক, তখন দেখা যাবে,' বলল হাসান। 'কিন্তু তার আগে···রাতে আপনি এখানে একা থাকবেন, এটা আমার ভাল ঠেকছে না।'

ম্লান হেসে শিরিন জবাব দিল, 'চিরকাল আমি একাই থাকব। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

হাসানের মনটা দমে গেল।

সাত

আরও এক মাস পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে এই প্রথম মৃদুলকে একটা চিঠি

লিখেছে শিরিন। ওদের আগের সেই সম্পর্ক নেই, এখন আর সে ওকে ভালবাসে না, এ-সব কথা খুব স্পষ্ট করে লিখেছে সে। প্রতিক্রিয়াটা হলো অদ্ভুত, মৃদুল চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। তা নিয়ে শিরিন অবশ্য কোন দুশ্চিন্তায় ভোগে না। মৃদুলের স্মৃতি বেশ অনেক দিন হলো তাকে আর কষ্টও দেয় না।

মৃদুল চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে শুনে ব্যবসার কাজে কক্সবাজার ছেড়ে ঢাকায় ফিরে গেছে হাসান। ওর একটা চিঠি পেয়েছে শিরিন, তাতে শুধু লেখা আছে, 'সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ।' একই সঙ্গে তারিনের চিঠিও পেয়েছে সে। তারিন লিখেছে—

'এখনও আমি মনে করি, তিনকন্যার অন্তত একটা অংশ আমাদের লীজ দেয়া উচিত। তোর যদি টাকার দরকার না-ও থাকে, আমার খুবই আছে। সবাই বলছে, হাসান সাহেবের প্রস্তাবটা সাংঘাতিক লোভনীয়। আমার তো মনে হয়, টাকা আরও বেশি দাবি করলে তাতেও রাজি হবেন ওঁরা।'

উত্তরে শিরিন লিখল—

'একবার তো স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছি যে তিনকন্যা কাউকে আমি লীজ দেব না। তোর যদি আরও টাকা দরকার হয়, আমার ভাগ থেকে মাসে মাসে আরও পাঁচ হাজার করে নিতে পারিস। আমার টাকা এখানে আমি চাইলেও খরচ করতে পারি না।'

তারিন জবাবে লিখল—

'তুই একটা বোকা ও পাজি মেয়ে। নিজের কিসে ভাল হবে তা-ই বুঝিস না, পরেরটা কিভাবে বুঝবি? খরচ করার সুযোগ না থাকলে যা বাঁচে সব পাঠিয়ে দে।'

তারিনকে টাকা পাঠাল শিরিন। সে জানে, বেশ কিছুদিন আর তাকে বিরক্ত করা হবে না।

হাসান আসছে না। সেজন্যে কেমন যেন বিষণ্ন আর একা একা লাগছে তার। প্রতি হপ্তায় আসত তো, ওর সঙ্গ পাওয়া একটা অভ্যেসে

দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সোমবার সকালে ঘুম ভাঙলেই কেমন একটা অস্থিরতা জাগে মনে। ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব। যদি মনে হয় হাসান আর কোনদিন না-ও আসতে পারে, মনটা হু হু করতে থাকে। আবার ভাবে, আমাকে ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ? আসতে ওকে হবেই। কিন্তু এলেই যে আমি নরম মাখন হয়ে যাব, সেটি হচ্ছে না! তিনকন্যাকে নিয়ে ওর স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে।

ইদানীং টেবিলে সব খাবার পড়ে থাকে। খাওয়ার রুচি নেই তার। সোমবার সারাটা দিন বাগানে বসে গান গায়, কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

তারপর শীত এসে গেল। এক সোমবার ভোরে ঘুম ভাঙা সত্ত্বেও সৈকতে হাঁটতে গেল না শিরিন। চান্দা তাগাদা দিয়ে গেল, নাস্তা তৈরি। আজ ওকে চোছিনের কথা জিজ্ঞেস করল সে। মাসের পর মাস পেরিয়ে যাচ্ছে, ছোকরা ফিরছে না কেন? চান্দা কথা না বলে কেঁদে ফেলল। কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। চোছিনকে প্রত্যাখ্যান করেছে অমরাবতী। কাজেই লজ্জায় ও অপমানে সত্যি সত্যি যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে গেছে সে।

চান্দা চলে যাবার পর বিছানা ছাড়ল শিরিন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নাস্তার টেবিলে বসল। চোছিনের ওপর শ্রদ্ধা জাগছে তার মনে। নিষ্ঠাবান প্রেমিক সে। অমরাবতীর জন্যে দীর্ঘ দশটা বছর ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করেছে। অমরাবতী প্রত্যাখ্যান করায় অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবেনি।

শিরিন ভাবল, চোছিনের সঙ্গে আমার কিছুটা মিল আছে। একটা আদর্শ আছে আমাদের। ব্যর্থ হবার পরও দু'জনেই আমরা ভালবাসার প্রতি বিশ্বস্ত থাকছি। তারপর ভাবল, তবে দু'জনেই প্রতারণার শিকার। শহরে রাখতে না পারলে বিয়ে করব না, অমরাবতীর এই শর্ত তো প্রতারণা করারই সামিল। মৃদুল আমাকে, অমরাবতী চোছিনকে ঠকিয়েছে। আর আমরা ভুগছি। ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? মৃদুল আর

অমরাবতী জিতে গেল না? তারা ভালবাসার সঙ্গে প্রতারণা করেও জিতে গেল। আর আমরা বিশ্বস্ত থেকেও হেরে গেলাম। তার মানে তো এই যে আমি আর চোছিন নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি। এটা স্রেফ একটা বোকামি। এর মধ্যে আদর্শ না ঘোড়ার ডিম আছে! চোছিনের অবশ্যই অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হওয়া উচিত। আমারও উচিত মৃদুলের কথা ভুলে গিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসা।

মৃদুলকে ভুলে যেতে আরও হয়তো খানিকটা সময় লাগবে, তবে ওকে ভালবাসতে না পারার অনেক কারণ বহু আগেই তৈরি করে রেখেছে মৃদুল। শায়লাকে বিয়ে করার পরও ওকে ভালবাসতে পারছিল শিরিন, এ-কথা জানা সত্ত্বেও যে মৃদুলকে কোনদিনই সে পাবে না। মৃদুলের বাইরের চেহারাটাই সব নয়, তার ভেতরে যে একটা পশু বাস করে সেটা ওর বিয়ের পর ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। তা না হলে শিরিন হয়তো ওদের ভালবাসার স্মৃতি বুকে নিয়ে সারাজীবন নিঃসঙ্গ থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

মৃদুলকে এখন ভালবাসা না গেলেও, ওর কথা সহজে ভুলতে পারবে না সে। ভুলতে পারবে না এই জন্যে যে মৃদুল তো পুরুষ জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করে। জীবনে এই একটি মাত্র পুরুষকে খুব কাছে টেনে নিয়েছিল সে, স্থান দিয়েছিল অন্তরের অন্তস্তলে; ওকেই যখন চিনতে পারেনি, আর কোন পুরুষকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে কি? কার ভেতর কি আছে কে তাকে বলে দেবে?

না, শিরিন আর কোন ঝুঁকি নেবে না। পুরুষরা তার কাছ থেকে শুধু ঘৃণাই পেতে পারে।

'শিরিন! শিরিন তুই কোথায়?' কে যেন গলা ফাটাচ্ছে।

হঠাৎ ঝট করে চেয়ার ছাড়ল শিরিন। 'ওমা, তারিন!'

দমকা বাতাসের মত ডাইনিং রুমে ঢুকল তারিন। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বোনকে। 'কি রে, আজ তুই জেটিতে যাসনি কেন?'

তারিনের দু'কাঁধে হাত রেখে মুখটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল শিরিন।

'কেমন আছিস? এত শুকিয়ে গেছিস কেন?'

'আমি শুকিয়ে গেছি, না? নিজের দিকে তাকাস? তোকে তো আমার পাটখড়ি মনে হচ্ছে। শোন, একা আসিনি, সঙ্গে বন্ধু আছে।'

'কই? কোথায় রেখে এলি? নিশ্চয়ই তোর ঢাকার কোন বান্ধবী?'

'বান্ধবী নয়, বন্ধু। আমি মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা করি না। তিন তিনটে সুটকেস, বয়ে আনতে সময় নিচ্ছে বেচারা।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল তারিন। 'হাসান, জলদি!'

শিরিন হতভম্ব। হাসান! তারিন ওর নাম ধরে ডাকছে! তুমি বলছে! শিরিনের বুকের ভেতর কি যেন একটা খচ করে বিঁধল। স্থির থাকার জন্যে টেবিলের কিনারা ধরল সে। নিজের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে নিজেই বিস্মিত হচ্ছে। হাসান আর তারিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলে তার কেন ঈর্ষা হবে? সে কেন অসুস্থ বোধ করবে? যে পুরুষকে সে নিজের জন্যে চায় না, তাকে অন্য মেয়ে চাইলে তার কেন খারাপ লাগবে?

ক্লান্ত লাগছে তার। নিজের কাছেই লজ্জা পাচ্ছে। হাসান রক্ত-মাংসের মানুষ, তারিনকে ওর ভাল লাগতেই পারে। তারিন ছটফটে, সারাক্ষণ হাসছে ও হাসাচ্ছে, প্রতি দিন নতুন নতুন ড্রেস পরে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। আচ্ছা, এই জন্যেই হাসান চিঠি লেখেনি তাকে। তারিনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, লেখার সময় পায়নি।

হাসান ডাইনিং রুমে ঢুকল। সুটকেসগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে সিধে হলো। শিরিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন?'

কথা বলতে নিজেকে বাধ্য করল শিরিন। 'আছি। আপনি ভাল তো? ভাবিনি আজ আপনারা কেউ আসছেন।' সে মনে মনে ভাবছে, কি কারণে ওরা একসঙ্গে এল? দু'জনের সম্পর্কটা কতদূর গড়িয়েছে?

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে বসল সবাই। সারাক্ষণ বকবক করছে তারিন। ঢাকার গল্প ওর আর শেষ হতে চায় না। অনেক ভক্ত জুটেছে

ওর, বলাই বাহুল্য যে সবাই তারা ছেলে।

তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকছে শিরিন। একবার হাসানের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হয়ে গেল। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে হাসান, তবে তারিনের কথা শুনে হাসছে সে। নাস্তা খাওয়া শেষ হতে তারিন শিরিনের হাত ধরে বলল, 'দোতলায় চল, তোকে একটা জিনিস দেখাব।' হাসানের দিকে ফিরল সে। 'হাসান, তোমাকে একবার মান্না কাকুর কাছে যেতে হবে। তাকে বলতে হবে, আসার সময় যে মাছগুলো ধরল, তা থেকে আমরা শুধু চিংড়িগুলো নেব।'

'এখুনি যাচ্ছি,' হাসিমুখে বলল হাসান, তারিন যেন ওকে জাদু করেছে।

হাসান ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে যেতে শিরিনকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল তারিন। শিরিনের বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। কি বলবে তাকে তারিন? কি দেখাবে? হাসান ওকে প্রেমপত্র লিখেছে? পরস্পরকে ভালবাসে ওরা? তাকে তারিন ওদের বিয়ের কথা জানাতে এসেছে?

'তুই এ-ধরনের ড্রেস পরিস কেন?' দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে তারিনকে জিজ্ঞেস করল সে। 'ঢাকায় হয়তো এ-সব মানায়, কিন্তু এখানে···,' কথাটা অসমাপ্ত রাখল শিরিন।

'আমি ড্রেস বা ফ্যাশন নিয়ে কথা বলতে আসিনি,' জবাব দিল তারিন। 'তবু যখন কথাটা তুললি, বলতেই হয়—জিনসের প্যান্ট পরাটা তিনকন্যাতেই বেশি মানানসই, ঢাল আর ধাপ বেয়ে চলাফেরা করতে অসুবিধে। শোন, আমি এসেছি ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে।'

তারমানে ওদের বিয়ে হতে যাচ্ছে না। অন্তত এখুনি নয়। পরম স্বস্তিবোধ করল শিরিন। 'দাঁড়িয়ে কেন, বোস না।'

তবু দাঁড়িয়েই থাকল তারিন। জানালা দিয়ে নিচের সৈকত দেখছে।

'ব্যবসা নিয়ে কি আলোচনা?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'আবার সেই তিনকন্যা প্রসঙ্গ, তাই না?'

পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল তারিন।

'একি রে? তুই সিগারেট ধরেছিস?' শিরিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'তুইও ধরতে পারিস, কেউ তোকে মানা করবে না,' জবাব দিল তারিন। 'আয়, কাজের কথা বলি। বারবার চিঠি লিখে বলছি যে আমার অনেক টাকা দরকার, কিন্তু তুই গা করছিস না। সেজন্যেই ভাবলাম, সামনাসামনি কথা হওয়া দরকার। আব্বু মারা যাবার পর দলিল-পত্র যা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে তিনকন্যা, কক্সবাজারের বাড়ি আরচট্টগ্রামের বাড়ির মালিক আমরা দু'জন। নগদ টাকাও পাব, তবে তা পেতে আরও তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। তুই কি চাস, তিনকন্যা লীজ না দিয়ে কক্সবাজার বা চট্টগ্রামের বাড়িটা বিক্রি করে দিই?'

'বিক্রি করার কথা উঠছে কেন?' শিরিনের গলায় ঝাঁঝ। 'আলোচনার কিছু নেই, তারিন। আব্বুর কোন সম্পত্তিই আমি বিক্রি হতে দেব না বা লীজও দেব না।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে তারিন। তারপর বলল, 'তুই যে প্যাঁচ কষবি, আমি জানতাম। তবে এ-ও জেনে রাখ যে আমরা খালি হাতে ফিরব বলে আসিনি।'

'আমরা? এরমধ্যে তাহলে হাসানও আছে?' হাসানের বিরুদ্ধে শিরিনের মনটা অকস্মাৎ তেতো হয়ে উঠল।

অস্বস্তিবোধ করছে তারিন। আমরা ওর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি সব ফাঁস করতে চায়নি। তবে বলেই যখন ফেলেছে, সংক্ষেপে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ।'

'উনি তাহলে তোর সঙ্গে নেই কেন?'

'নেই এই জন্যে যে তাকে আমি মাছ আনতে পাঠিয়েছি। তাছাড়া, ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে ভাল হয়।'

'তবে উনি জানেন যে আমার সিদ্ধান্ত বদলানোর চেষ্টা করবি তুই?'

'না জানলে বোকা বলব। হাসান জানে খুব বিপদে আছি আমি,

মোটা টাকা দরকার।'

'মোটা টাকা দরকার? মানে?' শিরিন ভয় পাচ্ছে।

'হাসানের কাছ থেকে আট লাখ টাকা ধার করেছি আমি,' ধীরে ধীরে বলল তারিন। 'খুব বড় একটা কাজে হাত দিয়েছি, টাকার অভাবে চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, এই সময় যেচে পড়ে টাকাটা দেয় সে আমাকে।'

'কি বলছিস এ-সব তুই?' শিরিনের মাথা ঘুরছে। ওঁর কাছ থেকে আট লাখ টাকা ধার করেছিস? আ-ট লা-খ টা-কা?'

'হ্যাঁ। তুই এরকম আকাশ থেকে পড়ছিস কেন?' তারিন হাসছে। 'আমি একটা বিশ লাখ টাকার প্রজেক্টে হাত দিয়েছি। হাসানকে আট লাখ শোধ করার পর আরও বারো লাখ লাগবে আমার। শোন, সরাসরি চাইনি আমি। পরিস্থিতিটা এমনভাবে ব্যাখ্যা করি, প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয় ও। তারপর এমন ভাব দেখাই, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচ্ছি। কাজটা আমি কৌশলে সেরেছি, বুঝলি!'

'এরকম একটা অন্যায় কাজ কিভাবে করতে পারলি তুই!'

'এর মধ্যে অন্যায় কি দেখলি? তুই সেকেলে থাকবি থাক, আমার ও-সবে পোষাবে না। আমার উপকারে লাগতে পেরে খুশিই হয়েছে হাসান।'

শিরিন ভাবল, খুশি হবে না! তারিনকে টাকা ধার দিয়ে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায় ও। গোটা ব্যাপারটাই তিনকন্যা দখল করার ষড়যন্ত্র। 'টাকাটা এখুনি ওকে তোর ফিরিয়ে দেয়া দরকার।'

'দিতে তো চাই-ই, কিন্তু কিভাবে?'

অস্থির হয়ে উঠল শিরিন, পায়চারি করছে। 'এত টাকা কি করলি? কিসের প্রজেক্ট তোর?'

'তিন কামরার অফিস ভাড়া নিয়ে কমপিউটর বসিয়েছি,' বলল তারিন। 'চল না একদিন, দেখে আসবি। মেঝেতে কার্পেট আছে, এসি বসিয়েছি। ওখানে কম্পোজের কাজ হবে, আবার কমপিউটর শেখানোও

হবে। ছ'মাসের মধ্যে আমার ওই অফিস থেকে মাসে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করব আমি।'

শিরিন কিছু বলছে না।

তারিনকে জেদী মনে হলো। 'আমি জানি, তুই বুঝতে চাইবি না। দোষ দিচ্ছি না, দুনিয়ার অন্ধকার কোণে পড়ে থাকলে এটাই স্বাভাবিক। তোর জগৎটা ছোট্ট এতটুকুন। বয়েসে কয়েক মিনিটের ছোট হওয়ায় আমাকে ভুগতে হচ্ছে।'

'কি বলেছিস ওকে? টাকাটা কবে নাগাদ ফেরত দেয়ার কথা?' জানতে চাইল শিরিন। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে সে।

'ভদ্র সন্তানেরা ধার দেয়া টাকা ফেরত চায় না। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দেব, তবে এ নিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছে হাসান। শুধু অনুরোধ করেছে, কথাটা কাউকে যেন না বলি। আমি যেন বলব!'

'কিভাবে শোধ করবি, ভেবেছিস কিছু?' এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল শিরিন।

'তুই কি চাস সেটার ওপর নির্ভর করে,' জবাব দিল তারিন। 'তিনকন্যা যদি লীজ দিতে না চাস, দুটো বাড়ির একটা বিক্রি করে দিতে হয়।'

'কিন্তু আমি যদি তিনকন্যা লীজ দিতে না চাই? বাড়িও যদি বিক্রি করতে না দিই?'

'কেন দিবি না?' ফোঁস করে উঠল তারিন। 'তুই তো বহুদিন ধরে বলে আসছিস, আব্বুর সম্পত্তি নিবি না। তাহলে আগলে রাখার চেষ্টা করছিস কেন?'

'বলেছিলাম বিয়ের পর নেব না। কিন্তু আমি বিয়ে করিনি। কোনদিন করবও না।'

'আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি,' বলল তারিন। 'আমি আমার সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছি।'

শিরিন রাগল না। শান্ত গলায় বলল, 'তা নিস নিবি। কিন্তু ভেবে দেখেছিস, কে এখানে জিতছে? হাসান জানে তিনকন্যা আমি লীজ দেব না, তাই সে তোকে টাকা ধার দিয়ে আমাকে বাধ্য করতে চাইছে। এটা ওর একটা ষড়যন্ত্র। আমি দুঃখ পাচ্ছি এই দেখে যে সেই ষড়যন্ত্রে আমার বোন ওকে সাহায্য করছে।'

'হাসান ব্যবসায়ী ছেলে, যেটাকে তুই ষড়যন্ত্র বলছিস সেটা আসলে ওর ব্যবসায়িক কৌশল...,' শিরিন নিঃশব্দে কাঁদছে দেখে থেমে গেল তারিন, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখ, নাটুকেপনা একদমই আমার পছন্দ নয়, অসহ্য লাগে। তিনকন্যা সোনার খনি নয়, লোকবসতিহীন তিনটে পাহাড় মাত্র। তা-ও সবটুকু লীজ দিতে বলছি না। শ্বেতবসনা অর্থাৎ আইরিন থাক, বাকি দুটো একুশ বছরের জন্যে দলিল করে দে।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল শিরিন। 'কাগজ-পত্র তৈরি কর, আমি সই করে দেব।'

ছুটে এসে শিরিনকে জড়িয়ে ধরতে গেল তারিন। 'সত্যি তুই রাজি হচ্ছিস? লক্ষ্মী বোন আমার! তোকে না আমি কি ভাল যে বাসি...।'

পিছিয়ে গেল শিরিন। 'থাক।'

'জানি তোর খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু দেখিস তিনকন্যার চেহারা দু'দিনেই যখন পাল্টে দেবে হাসান, তোরও সাংঘাতিক ভাল লাগবে।' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তারিনের চেহারা। 'হাসান তো পারলে আজ থেকেই কাজ শুরু করে দেয়। এই চান্দা, চল যাই সাঁতার কেটে আসি। ইস, কতদিন সাগর আমাকে পায়নি, নিশ্চয়ই খুব অভিমান করে আছে!'

তারিন চলে যাবার পর ঘরের মাঝখানে শিরিন স্থির মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মূর্তিটা নিষ্প্রাণ নয়, কারণ তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। তার এই কান্নার কারণ তিনকন্যা নয়। সে ভাবছে, অথচ মনে হয়েছিল হাসান আমাকে ভালবাসে! আভাসে-ইঙ্গিতে পরিষ্কারই প্রেম

নিবেদন করেছিল ও, বলতে চেয়েছে শুধু তিনকন্যার জন্যে নয়, তার জন্যেও গত কয়েক বছর ধরে বারবার এখানে ছুটে আসছে। সবই তাহলে মিথ্যে, বানানো গল্প। আসল উদ্দেশ্য ছিল তিনকন্যা দখল করা। সরাসরি প্রস্তাবে কাজ হয়নি, তারিনকে ফাঁদে ফেলে কাজ উদ্ধার করে নিয়েছে। ছি, মানুষ এত নোংরা হতে পারে।

ধীরে ধীরে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল শিরিন। একটা কথা ভেবে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল সে। ভাগ্যিস হাসানের প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয়নি সে! ওর আহ্বানে সাড়া দিলেও তিনকন্যা পাবার জন্য এই নোংরা কৌশল করত হাসান। তখন তার ভালবাসা বা দুর্বলতাকে ব্যবহার করত ব্ল্যাকমেইলিঙের কাজে। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করত যার সরল অর্থ দাঁড়াত—ওদের ভালবাসা সার্থক করতে চাইলে তিনকন্যাকে ওর হাতে তুলে দিতে হবে। সাড়া না দিয়ে বড় বাচা বেঁচে গেছে সে। আত্মসমর্পণের ইচ্ছে যে হয়নি, তা নয়। কতদিন ভেবেছে, হাসানের মত চরিত্রবান ছেলে সারা দেশে আর ক'টাই বা আছে। ভেবেছে, বছরের পর বছর তার পিছনে লেগে রয়েছে, ভাল না বাসলে সম্ভব হত কি? কোন কোন দিন গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে তার। সে-সব স্বপ্নে কে যেন তাকে পরামর্শ দিয়েছে, এই শিরিন, হাসানকে ফিরিয়ে দিস না। আশপাশের মানুষগুলোও ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে, হাসানকে তার প্রতিদান দেয়া উচিত। চান্দা, লোভা, চোছিন, মান্না শেখ, সবাই ওরা হাসানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে নিজেও তো এতদিন হাসানের কোন ত্রুটি দেখেনি। মুখে যা-ই বলুক, ওকে তার ভাল লাগতে শুরু করেছিল। মন তো টলে উঠেছিল সেই প্রথমবার দেখেই।

এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই শিরিনের, হঠাৎ ভারি একটা গলা পেয়ে চমকে উঠল সে।

'শিরিন! শিরিন!' হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল হাসান। 'সত্যি তুমি রাজি হয়েছ? তারিন বলছে, তোমার নাকি তিনকন্যা লীজ দিতে আপত্তি

নেই…?'

শিরিন একচুল নড়ছে না বা কথা বলছে না।

হাসানের মুখের হাসি নিভে গেল। 'তিনকন্যাকে তুমি কিরকম ভালবাস, আমি তা জানি,' নরম সুরে বলল আবার। 'তোমার মন খারাপ, কারণ ভাবছ আমরা বোধহয় এখানকার সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলব। কিন্তু তা সত্যি নয়, শিরিন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের প্রজেক্ট শেষ হলে তুমি দেখতে পাবে তিনকন্যা তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে, তার সৌন্দর্য শতগুণ বেড়ে গেছে…।' কিন্তু আবারও মাঝপথে থেমে যেতে হলো ওকে।

শিরিন ভাবছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন শত্রু, বন্ধু নয়। সে শুধু বলল, 'আমি ভবিষ্যতে কি দেখতে পাব সেটার কোন গুরুত্ব নেই, হাসান সাহেব। তারিন আট লাখ টাকা ধার করেছে, সেটা শোধ করার জন্যে তিনকন্যা লীজ দিতে রাজি হয়েছি আমি। এ-প্রসঙ্গে একটা অনুরোধ আছে আমার—আপনি ওকে আর কখনও টাকা দেবেন না। দ্বিতীয়বার ধার শোধ করা আমার জন্যে সহজ হবে না। আরেকটা কথা। শ্বেতবসনা বা আইরিনে অচেনা কোন লোককে আমি যেন না দেখি। বাকি দুটো পাহাড় আর নিচের তিন একর জমিই শুধু লীজ দেব আমরা।'

কথাগুলো চুপচাপ শুনল হাসান। মনক্ষুণ্ন ও আহত দেখাচ্ছে ওকে। 'ব্যাপারটাকে তুমি এভাবে দেখছ, সেজন্যে আমার খারাপ লাগছে। তারিনকে আমি ধার দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তিনকন্যা পাবার আশায় নয়। ওকে আমি বলেওছি, টাকাটা এক দেড় বছর পরে দিলেও ক্ষতি নেই, একসঙ্গেও দিতে হবে না।'

'এ-সব মিষ্টি মিষ্টি কথা কাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলছেন?'

হাসানের চেহারা লালচে হয়ে উঠল। 'যা সত্যি তাই বললাম, বিশ্বাস না করলে না-ই করবে। তবে তোমার এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাজে না বাধা হয়ে দাঁড়ায়।'

খানিক পর শিরিন বলল, 'আমাদের উকিলের ঠিকানা দেব

আপনাকে। দলিল, চিঠি-পত্র যা কিছু লেনদেন হবে সবই তার মাধ্যমে। আমার বা অন্য যে ক'টা পরিবার এখানে আছে তাদের কোন অসুবিধে না করে নিজের অংশে যা খুশি করতে পারবেন আপনি।'

'তুমি আমার ওপর রেগে আছ, তাই না?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল হাসান। 'কিন্তু কেন?'

'সম্পর্কটা ব্যবসার, হাসান সাহেব। অন্য কোন ব্যাপারে আপনি মাথা না ঘামালে ভাল করবেন।'

'কিন্তু আমি তো জানি সম্পর্কটা বন্ধুত্বেরও। সেটা কি নষ্ট হয়ে যাবে?'

হাসানের গলায় আবেদনের সুর, তবে সেটাকে শিরিন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে দিল না। বলল, 'এখন থেকে আমরা আর বন্ধু নই, হাসান সাহেব।'

'কিন্তু আমি চাই···।'

'আমি চাই না।'

'শিরিন!'

'আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন না, প্লীজ। তুমিও বলবেন না।'

'অন্তত বলো আমার অপরাধটা কি?'

'বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জবাব পেয়ে যাবেন।' ঘুরে দাঁড়াল শিরিন, দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল।

বড় জেটি না থাকলে বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে না, তাই প্রথমেই জেটি তৈরির কাজে হাত দেয়া হলো। তবে পুরানো জেটিটা ভেঙে ফেলা হয়নি, সেখানে প্রতিদিন মাল বোঝাই স্টীমার এসে ভিড়ছে একের পর এক। ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে সৈকতে ইঁট আর লোহার রডের পাহাড় জমে উঠল। বিশাল আকৃতির দুটো একচালা তৈরি করা হয়েছে, একটাতে তোলা হয়েছে সিমেন্ট, দ্বিতীয়টাতে শ্রমিকরা থাকবে। হাজার বস্তা সিমেন্ট ভরার পরও প্রথম একচালার অর্ধেক জায়গা এখনও খালি

পড়ে আছে।

তিনকন্যার সবাই যেন নতুন জীবন পেয়েছে। প্রত্যেককে কিছু না কিছু দায়িত্ব দিয়েছে হাসান, যতটুকু আশা করা যায় তারচেয়ে বেশি খাটাখাটনি করছে তারা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ডিজাইনার আর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটে হাসানের। রাতে শোয় চিরল চাকমাদের খামার বাড়িতে, রান্নাও করে দেয় চিরলের মা। দলিলে সই করার পর তারিন ঢাকায় ফিরে গেছে, সেই থেকে শ্বেতবসনায় প্রয়োজন ছাড়া আসে না হাসান।

শিরিনও শ্বেতবসনা ছেড়ে বড় একটা বেরোয় না। দু'একবার যদি বা বেরোয়, সৈকতে একেবারেই নামে না। নিচে কি ঘটছে কোনদিন সে দেখতে যায়নি। তবে চান্দা আর লোভা এসে গল্প করে। না শোনার ভান করে শোনে সে। কোন আগ্রহ দেখায় না।

পুরো শীতকাল জুড়ে তিনকন্যা যেন উৎসবমুখর মেলায় পরিণত হলো। নতুন জেটি তৈরি হবার পর বড় স্টীমার ভিড়তে পারছে। তিনটে জীপ আর দশটা মোটরসাইকেল পৌঁছুল। কয়েকটা জেনারেটর চালু করা হয়েছে, বাকি দুটো পাহাড়ও এখন রাতে আলোকিত থাকে। আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন একজন প্রতিমন্ত্রী। খামে ভরা সুদৃশ্য কার্ড হাতে নিয়ে শিরিনকে আমন্ত্রণ জানাতে এল হাসান, কিন্তু সে দেখা করল না। বলে পাঠাল অসুস্থ। কার্ডটা রেখে চলে গেল হাসান। অনুষ্ঠানে যায়নি শিরিন।

তারিন আর শিরিনের ঢালে ছোট আকৃতির স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশটা কটেজ তৈরি করা হচ্ছে। তারিনের পিছন দিকে বিরাট জায়গা জুড়ে তৈরি হচ্ছে ছোট একটা কৃত্রিম লেক, লেকের ওপারে থাকবে চিড়িয়াখানা। দুই পাহাড়ের সামনের দিকের মাটি কেটে তৈরি করা হয়েছে এলিভেটরের জন্যে শাফট। আগে শুধু আইরিনে ওঠার জন্যে ধাপ ছিল, এখন শিরিন আর তারিনে ওঠার জন্যেও ধাপ তৈরি করা হয়েছে, ধাপের কিনারায় লোহার রেইলিংও আছে। হোটেলটার পাশেই

থাকবে বিশাল একটা শপিং সেন্টার, সে কাজেও হাত দেয়া হয়েছে। শপিং সেন্টারে সব মিলিয়ে দোকান থাকবে দেড়শো, সেগুলো তৈরি হবার আগেই বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অগ্রিম টাকা দিয়ে বুক করে ফেলেছে। তারিনের চিঠি থেকে জানা গেল, দুই বোনের জন্যে নিচতলার চারটে দোকান রেখেছে ও।

তারপর শোনা গেল আগামী বছরের প্রথম দিকে তিনকন্যায় বিদ্যুৎ চলে আসবে। কক্সবাজার থেকে লাইন টেনে আনতে খরচ অনেক বেশি পড়বে, তাই ঠিক হয়েছে উখিয়া থেকে আনা হবে। তিনকন্যার পিছন দিকে গভীর জঙ্গল রয়েছে, সেই জঙ্গল কেটে তৈরি করা হবে একটা করিডর, দু'পাশে থাকবে কাঁটাতারের বেড়া, বন্য হাতি বা শুকর যাতে করিডরে ঢুকতে না পারে। করিডরটা সোজা চলে যাবে উখিয়ায়। পর্যটকরা শুধু সাগর পথে নয়, ওই করিডর ধরে বাস বা প্রাইভেট কার নিয়েও আসা-যাওয়া করতে পারবে।

সাড়ে তিনশো লেবার কাজ করছিল, ছ'মাস পর আরও দেড়শো বাড়ানো হলো। শ্বেতবসনা থেকে টাওয়ারের মত উঁচু ট্র্যাক্টর দেখতে পায় শিরিন, কংক্রিট মিকশ্চার মেশিনের অস্পষ্ট আওয়াজও শুনতে পায়। একদল শ্রমিক রাতেও কাজ করে, তাদের কোরাসও ভেসে আসে পাহাড়ের মাথায়। প্রায় প্রতি হপ্তায় কারও না কারও মাধ্যমে শিরিনকে খবর পাঠায় হাসান, নিচে নেমে একবার যেন সব দেখে যায় সে। শিরিন হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না, যায়ও না। সময় খুব কম পায় হাসান, তবু মাসে তিন চার বার শ্বেতবসনায় আসে। ইচ্ছে হলে কখনও দেখা করে শিরিন, বেশিরভাগ দিনই করে না। তার এত রাগ বা অভিমান কেন, বুঝতে চেষ্টা করে হাসান। তবে ভয় পায় তাকে, সরাসরি কোন প্রশ্ন করে না। ওর প্রজেক্টের ভাল-মন্দ সম্পর্কে আলোচনা করে, শিরিনের মতামত জানতে চায়। কোন রকম আগ্রহ দেখায় না শিরিন। হাসান বেশি চাপ দিলে মুখের ওপর বলে দেয়, 'আমি কি জানি। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।'

একবার হলো কি, এক মাস পেরিয়ে যাচ্ছে, হাসান একবারও শ্বেতবসনায় এল না। মনটা ছটফট করছে শিরিনের, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। সবাই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে হাসানের নাম শুনলেও তার চেহারা ভারি হয়ে যায়। তাছাড়া, জিজ্ঞেস করার জন্যে সুযোগ পাওয়া চাই তো। চান্দা শুধু তিনবেলা রান্না করে দেয় তাকে, সারাদিন আর দেখতে পাওয়া যায় না ওকে। রাতেও শিরিন একা থাকে। চান্দা আর লোভা আজকাল পুতুল তৈরিতেই ব্যস্ত। ওদের টাকা নেই, দোকান পাবার কথা নয়, তবে হাসান বলেছে বাকিতে একটা দোকান দেয়া হবে ওদেরকে। বাঙ্গালী ও আদিবাসী সবগুলো পরিবারকেই নাকি একটা করে দোকান দেয়া হবে। বাঙ্গালী পরিবারগুলোর পুরুষরা তিনকন্যায় থাকত না, আশপাশের শহরে কাজ করত তারা। তাদের সবাইকে খবর দিয়ে আনিয়েছে হাসান। চান্দারা পুতুল তৈরির দশজন কারিগর আনিয়েছে কক্সবাজার থেকে। সারা বছর ধরে ওরা যত পুতুল তৈরি করবে সব নাকি এক মরশুমে বিক্রি হয়ে যাবে। বার্মিজ অনেক মাল-পত্র আসছে, দোকানে দোকানে সাজানো হবে। খুদে কয়েকটা গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীও আগামী মাস থেকে চালু হবে।

মনটা ছটফট করছে, অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে চান্দাকে একদিন জিজ্ঞেস করল শিরিন, 'তোদের হাসান সাহেবের কি হয়েছে রে?'

'কি হয়েছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল চান্দা।

'না, মানে, ঘন ঘন আসছিল, এখন একদম আসে না, তাই জানতে চাইছি।'

'ওমা! সই, সত্যি তুমি কিছু জানো না?'

মাথা নাড়ল শিরিন। 'কি জানব?'

'হাসান সাহেবের সব কাজ তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'কি বলছিস! কেন?'

'চার ভাগের মাত্র তিন ভাগ কাজ শেষ হয়েছে, অথচ সব টাকা শেষ,' বলল চান্দা। 'সাহেবের নিজের টাকা তো কবেই শেষ হয়ে

গেছে। ব্যাংক থেকে লোন নিলেন, তাও তিন মাসে উড়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার-কর্জ করে কাজ চালাচ্ছিলেন, তারপর আবার হাত খালি। তাই নতুন ব্যাংক লোন পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে গেছেন।'

'তাহলে হাসান এখন ঢাকায়?'

'গেছে এক মাস হয়ে এল। হয়তো লোন পাচ্ছেন না বলে ফিরছেন না। বলেই গেছেন, পাবার আশা খুব কম।'

'তাহলে কি হবে?' শিরিনের খুশি হবার কথা, অথচ ঘটছে উল্টোটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চান্দা। 'কি আবার হবে, এভাবে পড়ে থাকবে সব। ইঞ্জিনিয়াররা বলাবলি করছিল, কাজ শেষ করতে না পারলে হাসান সাহেব না পাগল হয়ে যান। কমপ্লিট করতে না পারলে তো এসবের এক পয়সাও দাম নেই। পথের ফকির হয়ে যাবেন তিনি।'

কেন যেন কান্না পাচ্ছে শিরিনের। তাড়াতাড়ি চান্দার সামনে থেকে পালিয়ে এল সে।

তারিনের একটা চিঠি এল। দুটো নতুন খবর পেল শিরিন। একটা খবর, নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীর নামে কোর্টে কেস করেছিল শায়লা। আর মৃদুল স্ত্রীর বদস্বভাবের অজুহাত দেখিয়ে ডিভোর্স চেয়ে কেস করেছিল শায়লার নামে। নির্যাতনের অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় দেড় বছরের জেল হয়েছে মৃদুলের। ডিভোর্সের কেসটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে, মৃদুল জেল খেটে বেরুবার পর শুনানি শুরু হবে আবার। মৃদুল কেন তাকে চিঠি লেখা বন্ধ করেছে, এতদিনে বুঝতে পারল শিরিন। খবরটা শুনে ভাল-মন্দ কোন অনুভূতিই তার হলো না।

দ্বিতীয় খবরটা হলো, ধারের আট লাখ টাকা তারিনের কাছ থেকে আজও ফেরত নেয়নি হাসান। টাকার খুব দরকার ওর, এ-কথা শুনে কয়েকবারই দিতে চেয়েছে তারিন, কিন্তু হাসান নিতে রাজি হয়নি। এ-

ব্যাপারে ওর বক্তব্য হলো, এই টাকার জন্যেই শিরিন ওকে ভুল বুঝেছে। শিরিনের সেই ভুল ধারণা যতদিন না ভাঙে ততদিন টাকাটা নেবে না। খবরটা জানিয়ে একটা পরামর্শও দিয়েছে তারিন, লিখেছে—'তুই বললে হয়তো নেবে। চিন্তা করে দেখিস, বলবি কিনা।'

এক হপ্তা পর ঢাকা থেকে তিনকন্যায় ফিরল হাসান। বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—ব্যাংক থেকে নতুন লোন পাওয়া গেছে। হাসানের অনুপস্থিতিতে কাজ একটু ঢিমে তালে এগোচ্ছিল, আবার তা পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। হাসানকে ডেকে পাঠাবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না শিরিন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। আসলে লজ্জাটাই তার কাল হয়েছে। মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে নতুন একটা সম্পর্ক করার জন্যে, কিন্তু সর্বনেশে সংকোচ আড়ষ্ট করে রেখেছে তাকে, সহজ বা স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। সিদ্ধান্ত আর নেয়া হলো না, এক হপ্তা পর হাসান নিজেই দেখা করতে এল।

'তারিনের কাছ থেকে আপনি টাকাটা নেননি। মাত্র ক'দিন আগে জানতে পারলাম কথাটা। নেননি কেন?'

'ওই টাকাই তো তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে,' জবাব দিল হাসান। 'না টাকাটা ওকে ধার দিই, না তুমি আমাকে ভুল বোঝো।'

'দূরে সরিয়ে দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'দূরে সরিয়ে দিয়েছে মানে? নিজেও জানেন না কি বলছেন! আপনি চিরকালই দূরে ছিলেন, আজও আছেন, চিরকাল থাকবেনও তাই। আর আমার ভুল বোঝার ব্যাপারটা, এটারও কোন গুরুত্ব নেই। আমি ভুল বুঝেছি কি ঠিক বুঝেছি, সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—বাচ্চা ছেলের মত সেজন্যে আপনার অভিমান করা মানায় না।'

'আমি আসলে বলতে চেয়েছি, তোমার কাছাকাছি হবার একটা সুযোগ ছিল আমার, টাকাটা ধার দিয়ে সেই সুযোগটা আমি হারিয়েছি।'

'কোন সুযোগই আপনার ছিল না। এ-সব আপনার উদ্ভট কল্পনা

মাত্র। আপনাকে আমি কি বলেছিলাম—না। এই না শুধু তিনকন্যার প্রসঙ্গে বলিনি। আমার নিজের প্রসঙ্গেও বলেছিলাম। আপনি এত বোকা নন যে বোঝেননি। কাজেই কোন সুযোগই আপনার ছিল না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। 'তাহলে আমার কথাটাও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। আমি শুধু তিনকন্যার প্রেমে পড়িনি। তোমাকেও আমার ভাল লেগেছে। আজ তিনকন্যায় যা কিছু ঘটছে, সবকিছুর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য আমার, তোমার মন জয় করা।'

'ধন্য আশা কুহকিনী!' হেসে উঠল শিরিন। 'এ-ধরনের কথা আভাসে আগেও আপনি বলেছেন। উত্তরে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে? আরেকবার শুনুন বরং—আমি আপনার পরাজয় দেখার অপেক্ষায় থাকব।'

'তাহলে এ-ও শুনে রাখো, সত্যি যদি পরাজিত হই আমি, এমন একটা কাণ্ড করে যাব যে সারাজীবন তোমাকে কাঁদতে হবে।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' বেসুরো গলায় হেসে উঠল শিরিন। 'জোর করে ভালবাসা আদায় করতে চান?'

'শিরিন,' হঠাৎ সুর নরম করল হাসান, অসহায় দেখাল ওকে। 'আমার অপরাধটা কি বলবে? কেন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না?'

'আপনার অপরাধ কতটুকু দায়ী তা আমি জানি না,' জবাব দিল শিরিন। 'তবে জানি যে এরজন্যে অনেকটাই দায়ী পুরুষজাতির প্রতি আমার অপরিসীম ঘৃণা। ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে আমার অসহ্য লাগে, এ সত্যি নয়। তবে যখনই ভাবি যে আপনিও পুরুষজাতির একজন প্রতিনিধি, তখনই শামুকের মত নিজের ভেতর গুটিয়ে যাই আমি। কাজেই, আমার আশা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'শিরিন, সব পুরুষ সমান নয়। এতদিন দেখেও আমাকে তুমি চিনতে পারোনি? আমি মৃদুল নই। কি জানো, তোমার আশা ছেড়ে দিতে হলে আমি বাঁচব না।'

'দুঃখিত। এসব আমি শুনতেও চাই না।'

হাসান হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'একটা প্রশ্ন করব। উত্তরটা কি সত্যি হবে?'

'আমি কখনও মিথ্যে উত্তর দিয়েছি?'

'অন্তত একটা কথা তুমি মিথ্যে বলছ বলেই আমার ধারণা,' বলল হাসান।

রেগে গেল শিরিন। 'কি কথা?'

'আমার ধারণা,' বলল হাসান, 'তুমিও আমাকে ভালবাস। কিন্তু কথাটা যে কোন কারণেই হোক স্বীকার করছ না।'

হাসানের দিকে পিছন ফিরল শিরিন। 'আপনি আপনার ধারণা নিয়ে থাকুন, কে আপনাকে বারণ করেছে।'

'কি বলছ তার মানে জানো? বারণ না করলে আমাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। তাছাড়া, এই যে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, এ থেকেও বোঝা যায় যে তুমি আমাকে ভালবাস।'

'আপনার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে এবার আপনি আসতে পারেন।'

'আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

কথা না বলে অপেক্ষা করছে শিরিন।

'প্রশ্নটা হলো, তুমি কি এখনও মৃদুলকে ভালবাস?'

'না,' বলল শিরিন। 'আমি আর কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারব না। জানতে পারি, এ প্রশ্ন কেন করছেন?'

'এই জন্যে যে তুমি যদি মৃদুল বা আর কাউকে ভালবাস, তোমার জীবন থেকে সরে যাব আমি।'

'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আপনি খুব দুর্বল প্রেমিক।' হেসে উঠল শিরিন, হাসানের দিকে ফিরল। 'প্রতিযোগিতাকে ভয় পান।'

'প্রতিযোগিতায় জিতলাম অথচ তোমার মন পেলাম না, তাতে কি লাভ? বিজয়ী হবার চেয়ে তোমার সুখটাই আমার কাছে বড়, শিরিন। তুমি যদি আর কাউকে ভালবেসে সুখী হও, আমি তাতে বাধা দেব না।

ভাল কথা, যে জন্যে আসা—আমরা কাজ শুরুর পর থেকে নিচে তুমি একবারও নামোনি। কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'আমরা কি তোমার কোন অসুবিধে করছি?'

মাথা নাড়ল শিরিন।

'ওখানে কি হচ্ছে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?'

শিরিনের গলা বরফের মত ঠাণ্ডা, 'না।'

খানিক পর হাসান বলল, 'তিনকন্যা লীজ নিয়ে আমি যদি কোন অপরাধও করে থাকি, আমাকে কি মাফ করা যায় না?'

'আমি কি বলেছি, আপনি অপরাধ করেছেন?'

'তা না হলে আমার ওপর তুমি রেগে আছ কেন?'

'দেখুন, এভাবে আমাকে বিরক্ত করার কোন অধিকার নেই আপনার।' রেগে গেল শিরিন।

'ঠিক আছে। এ-সব প্রসঙ্গ বাদ। শুধু একটা কথা বলে যাই। সব কাজ শেষ হতে আর হয়তো ছ'মাস লাগবে। তারমানে ধরে নেয়া যায় আগামী বছর মার্চে আমরা ব্যবসা শুরু করতে পারব। কথাটা হলো, শুভ উদ্বোধনের দিনে প্রধান অতিথি থাকবেন কোন প্রতি মন্ত্রী বা মন্ত্রী, কিন্তু উদ্বোধন করবে তুমি। আমার সব কথায় না বলে এসেছ, অন্তত এই একটি ব্যাপারে না বোলো না।'

'না।'

'শিরিন, প্লীজ!'

'না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হাসান। তারপর ঘুরে দাড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। দরজার কাছ থেকে বলল, 'তোমার এই না আমি মেনে নেব না। আমারও প্রতিজ্ঞা, তোমাকে দিয়েই শুভ উদ্বোধন করা হবে।' তারপর আব দাঁড়াল না।

আট

নিখোঁজ চোছিন হঠাৎ করেই ফিরে এল তিনকন্যায়। একা নয়, অমরাবতীকে বিয়ে করে এনেছে সে। চান্দাই এসে খবরটা দিল। 'কি সই, আমার ভাইয়ের বউকে কি দেবে তুমি? কাল তো সে বউ নিয়ে দেখা করতে আসছে তোমার সঙ্গে।'

'কি দেব দেখতেই পাবি,' বলে হেসে উঠল শিরিন। 'তুই দাঁড়া, অমরাবতীকে এখুনি আমি দেখতে যাব।' নিজের বেডরুমে চলে এল সে। চোছিন অমরাবতীকে বিয়ে করতে গেছে, এ-কথা শুনেই মান্না শেখকে দিয়ে সোয়া ভরি ওজনের একটা নেকলেস বানিয়ে রেখেছিল, আলমিরা খুলে বের করল সেটা।

তখন পড়ন্ত বেলা, পা চালিয়ে হাঁটছে ওরা। চান্দা সারাক্ষণ বকবক করছে। চোছিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে অমরাবতী জানায়, দশ বছর অপেক্ষা করেছে, প্রয়োজনে সারাজীবন অপেক্ষা করবে, বিয়ে হলে তার চোছিনের সঙ্গেই হবে, তবে শর্ত একটাই—শহরে রাখতে হবে তাকে। কেন? না, শহরে ঘর বাঁধতে না পারলে ছেলেমেয়েকে সে মানুষ করতে পারবে না। শহর ছাড়া ভাল স্কুল কোথায় পাবে তারা? তার যুক্তি মেনে নিয়ে বিয়ের পর বউকে নিয়ে রামু শহরে উঠেছিল চোছিন।

শিরিন জানতে চাইল, 'তাহলে এখানে ফিরে এল কি মনে করে?'

'আসবে না!' অবাক হয়ে তাকাল চান্দা। 'তিনকন্যা শহর হতে যাচ্ছে না?'

শিরিন বলল, 'কিন্তু তিনকন্যায় তো স্কুল নেই।'

'ওমা, তুমি তো তাহলে কিছুই জানো না, সই। ভাই আমার কোথায় আছে জানতে পেরে হাসান সাহেবই তো তাকে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছেন। মান্না কাকুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, তিনকন্যায় শিগগির একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলা হবে।'

'ও, তাই বুঝি।' শিরিন ভাবল, সবাই সব কিছু জানে, একা শুধু সেই কিছু জানে না। হাসান যেন জাদু করেছে তিনকন্যার সব মানুষকে, ওর কথায় তারা ওঠে আর বসে।

অমরাবতীকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না শিরিন। চাঁদপানা মুখটায় কোন দাগ নেই, ভরাট স্বাস্থ্য, বার্মিজ লুঙ্গি আর ব্লাউজে মানিয়েছেও দারুণ। শুধু রূপ আর যৌবন নয়, গুণও আছে মেয়েটার। লজ্জা না করে স্ত্রীর সে-সব গুণের ফিরিস্তি দিয়ে গেল চোছিন। এস.এস.সি. পাস অমরাবতী। কাজ চালাবার মত ইংরেজি বলতে পারে। সে খুব ভাল গায়, নাচতেও পারে। রাখাইন তরুণদের একটা ব্যাণ্ড পার্টিতে কিছুদিন গেয়েছে। মাত্র আজ সকালে এসেছে, এরইমধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, লোভা আর চান্দাকে নাচ শেখাবে সে। গান তো ওরা পারেই। ওরা তিনজন, আরও পাঁচ-সাতজন রাখাইন তরুণকে ডাকা হবে, দাঁড়িয়ে যাবে আদিবাসী ব্যাণ্ড। চোছিন জানাল, আইডিয়াটা দারুণ পছন্দ করেছে হাসান। শুধু তাই নয়, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল-টায় নিয়মিত অনুষ্ঠান করার সুযোগ দেয়া হবে ওদেরকে।

নেকলেসটা পরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল শিরিন। সবার মুখে হাসানের এত প্রশংসা শুনে তার পাগল হবার অবস্থা হয়েছে। ওর প্রশংসা করার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে চায় সে-ও। হাসান কতটা ভাল, ওরা আর কি জানে! সে শুরু করলে ওদের কোন প্রশংসারই কোন তাৎপর্য থাকবে না। সেই প্রথম দিন দেখার পর থেকে আজ চার বছরের বেশি হতে চলল হাসান সম্পর্কে কত ভাল ভাল কথাই না জমা হয়েছে তার মনে। কেউ যখন ওর কোন প্রশংসা করে, সেই জমে থাকা কথাগুলো

বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু হলে কি হবে, প্রকাণ্ড একটা বাধা সব চাপা দিয়ে রাখে। হাসানের কাছে ছুটে যাবার জন্যে জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত শর বিদ্ধ পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করে সে, কিন্তু কি এক সংকোচ টেনে রাখে তাকে, পা বাড়াতে দেয় না। হাসান তার সঙ্গে দেখা করতে এলে ইচ্ছে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে, কিন্তু পারে না, তার বদলে চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। কয়েক মাস ধরেই একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে। সে কি অসুস্থ? মানসিক বিপর্যয়ের শিকার?

এটা যদি তার রোগ হয়, তাহলে সে রোগের চিকিৎসাও আছে। নিজে যখন সারাতে পারছি না, কারও সাহায্য নিলে ক্ষতি কি। মনের সমস্ত আবেগ ও ভালবাসা এভাবে চেপে রাখলে শেষ পর্যন্ত সে না পুরোপুরি পাগল হয়ে যায়।

চোদ্দিন ফিরে এসেছে দু'মাস পার হতে চলল। তারিনকে চিঠি লিখেছে শিরিন, সব কাজ ফেলে ও যেন তিনকন্যায় চলে আসে, তার খুব বিপদ।

তারিনের অপেক্ষায় রয়েছে শিরিন, এই সময় একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এল হাসান। ওর ট্যুরিস্ট সেন্টারের একটা মডেল হাতে করে নিয়ে এল, বলল, 'এখানে যেমন দেখছ, নিচে আমরা তাই বানাচ্ছি। দেখে বলো, কেমন লাগছে।'

সেদিকে তাকালই না শিরিন। 'ভাল।'

'না দেখেই ভাল বলে দিলে?'

এবার তাকাল শিরিন। 'ভাল। এবার খুশি হয়েছেন তো?'

হাসান হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো শিরিন-এর বানান লেখো এভাবে, তাই না—তালব্য শ-য়ে হ্রস্ব ই, ব-য়ে শূন্য র-য়ে হ্রস্ব ই, দন্ত্য ন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তোমার নামের অর্থ আমি জানি না। তবে অন্য বানানে বাংলায়

আরও একটা শব্দ আছে, একই উচ্চারণ—তালব্য শ-য়ে দীর্ঘ ঈ, ব-য়ে শূন্য র-য়ে দীর্ঘ ঈ, দন্ত্য ন।'

'শীরীন?' জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'তো কি হলো?'

'এই শীরীন শব্দটার মানে জানো? জানি, জানো না। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, লাল শীরীন ঠোঁট। শীরীন মানে হলো সুমিষ্ঠ, মধুর, মনোহর। শব্দটা ফারসি থেকে বাংলায় এসেছে।'

'তো কি হলো?' চেষ্টা করেও গলার সুর নরম রাখতে পারছে না শিরিন।

হাসান হাসল। 'আমার পর্যটন ব্যবসার নামকরণ করেছি শীরীন ট্যুরিস্ট সেন্টার। জানতে এলাম, তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

'আশ্চর্য তো! আপনার কি মাথা খারাপ হলো? লোকে কি বলবে? আপনার ব্যবসার নাম আমার নামে কেন রাখবেন আপনি?'

'তোমার পছন্দ হয়নি?'

'এটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার না,' রেগে উঠছে শিরিন। 'ভদ্রতা, রুচি, অনধিকার চর্চা, গায়ে পড়া ভাব, মান-অপমান ইত্যাদির ব্যাপার। এই নাম রাখলে লোকে ভাববে আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে আমার। হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। আমি বিব্রত বোধ করব।'

হাসান কথা বলছে না।

'না,' কঠিন সুরে বলল শিরিন। 'এই নাম আপনি রাখতে পারবেন না।'

এতক্ষণে আবার হাসল হাসান। 'শীরীন তোমার নাম নয়। কেউ জিজ্ঞেস করলে ব্যাখ্যা করে বলে দিয়ো, বলে দিয়ো যে তোমার সঙ্গে আমার বা এই নামের কোন সম্পর্ক নেই। আমি বলতে চাইছি, নামটা রাখতে তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো না।'

'তা পারি না,' স্বীকার করল শিরিন। 'এমন কি শীরীন না রেখে শিরিন রাখলেও বাধা দিতে পারি না। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, এই নাম রাখলে আপনার সঙ্গে আমার সরাসরি শত্রুতা শুরু হবে।

আপনি কি সেটাই চাইছেন?'

হাসান বলল, 'কয়েক বছর ধরে কম চেষ্টা তো করলাম না, বন্ধুত্ব আর হলো কই। তুমি তো প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে শত্রু হিসেবেই দেখে আসছ। এখন থেকে না হয় আমিও তোমাকে শত্রু হিসেবে দেখলাম, হয়তো কোন লাভ হলেও হতে পারে।'

'না।'

'কি না?'

শিরিন বলতে চাইল, আপনাকে আমি শত্রু হিসেবে দেখি না। কিন্তু বলল, 'এই নাম আপনি রাখতে পারবেন না।'

'পারব না মানে? রাখা হয়ে গেছে। আজ নয়, রেজিস্ট্রি করার সময়, প্রায় এক বছর হতে চলল।'

শিরিন বলতে চাইল, আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু বলল, 'আপনি একটা ছোটলোক।'

হাসান চলে গেল। শিরিনের কান্না পাচ্ছে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করল সে।

সব কথা শুনে তারিন বলল, 'তাহলে তো সিরিয়াস অবস্থাই। চেষ্টা করে দেখেছিস, নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই?'

'থাকলে চিঠি লিখে তোকে আসতে বলব কেন,' জবাব দিল শিরিন।

'তাহলে দেরি করা ঠিক হবে না। মান্না কাকুকে খবর দিই, এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে যাই আমরা। সন্ধের আগে কক্সবাজারে পৌঁছুতে পারলে ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়ে আজই আবার ফিরে আসা যাবে।'

'না।'

'না মানে?'

'আমি রাতে যাব। কেউ যাতে না দেখে। যাব বোরকা পরে।'

'বোরকা পরে যাবি? কেন? বোরকা পাবিই বা কোথায়?'

'পুরানো একটা বাক্সে আম্মুর একটা বোরকা আছে, আমি বের করে রেখেছি।'

'তুই দেখছি···।'

তারিনকে বাধা দিল শিরিন, বলল, 'তুই বুঝতে পারছিস না? এ-সবও তো আমার অসুখেরই নমুনা, উপসর্গ। হাসান বা আর কাউকে জানতে দিতে চাইছি না যে ওদের পর্যটন সেন্টার আমি দেখেছি। শুধু বোরকা পরব না, চোখে পট্টি বেঁধে যাব। তুই আমার হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে যাবি।'

গালে হাত দিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে থাকল তারিন। 'ঠিক আছে, তাই হবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও।

'আরেকটা কথা,' বলল শিরিন। 'মান্না কাকু এখন আর রাজহংস চালায় না। শুনেছি তাকে হাসান একটা ইয়ট কিনে দিয়েছে, সেটাই চালায়।'

'জানি,' বলল তারিন। 'ওই ইয়টে চড়েই তো এলাম আমি।'

'আমি ওটায় চড়ব না। কেননা ওটা হাসানের। পুরানো জেটিতে রাজহংস আছে, আমি ওটায় চড়ে কক্সবাজারে যাব। মান্না কাকুকে খবর দিয়ে রাখ। কাল সন্ধের পর রওনা হব আমরা।'

তারিন বলল, 'তোর এই রোগ কোন ডাক্তার ভাল করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'আমারও তাই ধারণা। তবু গিয়ে দেখি না কি বলেন। ডাক্তারের ব্যাখ্যাটা আমার কাজে লাগতেও পারে।'

ডাক্তারকে দেখেই হতাশ বোধ করল শিরিন। বয়েস এত কম, ছোকরা বলে মনে হয়। তার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বিস্তারিত শোনার সময় ছোকরা ডাক্তারকে খুব একটা মনোযোগী বলেও মনে হলো না।

'আপনার সমস্যা তাহলে হাসান নামে এই ভদ্রলোককে নিয়ে। তাঁর প্রতিটি কথায় আপনার হ্যাঁ বলতে ইচ্ছে করে, অথচ কিছুতেই হ্যাঁ

বলতে পারেন না, প্রতিবার শুধু না বলেন—সংক্ষেপে এই হলো সমস্যা, তাই না?'

'জ্বী,' বলল শিরিন।

'কি ভাবে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো, তারপর কি কি ঘটেছে, আরেকবার সব ব্যাখ্যা করুন।'

আবার সব নতুন করে বলল শিরিন।

ডাক্তার নোট নিচ্ছিল। শিরিন থামতে সেটা পড়ল। তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'জটিল কেস হলে কাল আবার আসতে বলতাম আপনাকে। তার দরকার হবে না।'

'আপনি তাহলে আমার রোগটা ধরতে পেরেছেন?'

ডাক্তার হাসল। 'তা পেরেছি, তবে এর কোন চিকিৎসা আমি করতে পারব না। করতে পারব না মানে, এর কোন চিকিৎসা কোন ডাক্তারের কাছে নেই। নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হবে।'

'তাহলে আপনার কাছে এসে লাভ হলো কি?'

'লাভ হলো এই যে রোগটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি। আপনার ধারণা, রোগটা কি আপনি তা জানেন। তা সত্যি নয়। আমি বলার পর রোগটা কেন কি থেকে হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটা ধারণা জন্মাবে, ফলে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারবেন।'

'বেশ, বলুন।'

'আপনার এই রোগের নাম দেয়া যেতে পারে দুঃখবিলাস,' বলল তরুণ সাইকিয়াট্রিস্ট। 'আপনার আব্বুর অনেক টাকা ছিল, আম্মুর সঙ্গে আব্বু প্রতারণা করায় ওই টাকার প্রতি আপনার অবচেতন মনে একটা বিতৃষ্ণা জন্মায়। টাকাই যত নষ্টের মূল, এই রকম একটা ধারণা শিকড় গেড়ে বসে আপনার ভেতর। সেজন্যেই যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই আব্বুর সম্পত্তি নিতে চাননি আপনি। মৃদুলকে ভালবাসতে পারার পিছনেও এই কারণটা কাজ করেছিল। মৃদুলের টাকা ছিল না, এটাকে শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেয় আপনার মন। এই একটা "শুভ লক্ষণ" দেখে

এমনই আকৃষ্টবোধ করেন যে তার সমস্ত খারাপ গুণ আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আর্থিক কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকায় একটা গৌরব আছে, এ-ধরনের ভুল ধারণারও জন্ম হয় আপনার মনে। হাসান সাহেবের সব আপনার ভাল লেগেছে, কিন্তু তাঁর টাকা আছে এবং তিনি আরও টাকা কামাতে চান, এটা জানতে পেরে আপনার ভেতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেজন্যেই তাঁর প্রতিটি কথায় হ্যাঁ বলতে ইচ্ছে করলেও প্রতিবার মুখ দিয়ে শুধু না বেরুচ্ছে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল শিরিন। ডাক্তার বলার পর তার যেন চোখ খুলে গেছে। দু'মিনিট চুপচাপ বসে থাকল সে। তারপর বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, 'আপনার উপকার কোনদিন আমি ভুলব না। কিন্তু নিজের চিকিৎসা আমি কিভাবে করব?'

'করুণ সুর পরিহার করুন। মিলনের কথা বলে, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কথা বলে, ফুর্তি ও উপভোগের কথা বলে, এরকম গান গাইবেন। একা বা বান্ধবীদের নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে বাগানে নাচুন। পিকনিকে গিয়ে যেমন খুশি তেমন সাজুন। ইচ্ছে হলে এক-আধটু মদ খেতে পারেন। ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে হলে করবেন। আর খরচ করতে শিখুন। দামী সেন্ট ব্যবহার করাটা জরুরী। আরও জরুরী···।'

এক গাদা উপদেশ আর পরামর্শ নিয়ে ফিরে এল শিরিন তিনকন্যায়। তারিনের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'এ বড় কঠিন রোগ রে, তারিন। চিকিৎসা এত সহজ বলেই মনে হচ্ছে রোগটা আমার কোনদিন সারবে না। তুই খেয়াল করিসনি, কঠিন সব কাজ অনায়াসে করতে পারি আমি। পারি না শুধু সহজগুলো।'

ডাক্তার দেখানোর পর দু'মাস পার হতে চলেছে, উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। আজ সকালে হাসান তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দেখা হবে না বলে বিদায় করে দিয়েছে শিরিন। চান্দাকে বলে গেছে দুপুরে আবার আসবে।

তখনও পরিবেশন করা হয়নি, তবে ডাইনিং টেবিলে খেতেই বসেছে শিরিন। হাসানকে দেখে তার বলতে ইচ্ছে করল, শ্বেতবসনায় অনেক দিন হলো আপনি খান না। আজ আমার সঙ্গে বসুন। কিন্তু বলল, 'আবার এই অসময়ে?'

হাসানকে খুব ক্লান্ত আর মনমরা লাগছে। 'একটা কথা বলতে এলাম।' এক হপ্তার মধ্যে জাপানে যাবে ও, তবে সে-কথা বলার জন্যে আসেনি। শীরীন ট্যুরিস্ট সেন্টারের কাজ শতকরা আশি ভাগ শেষ হয়েছে, বাকি বিশ ভাগ কাজ শেষ করার মত টাকা ওর হাতে নেই। তিনটে ব্যাংক থেকে বাহাত্তর কোটি টাকা লোন নেয়ার পরও ফেল করছে বাজেট। জাপানে ওর যে-সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো বিক্রি করে টাকা যোগাড় করতে হবে ওকে।

শিরিন লক্ষ করল, আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে হাসান। ও যে কোন ব্যাপারে চিন্তিত, তা-ও বুঝতে পারল। 'দেখে মনে হচ্ছে খুব সুখে আছেন। নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ দেবেন?' অথচ ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে আপনার?

'তোমাকে জানাতে এলাম, তিনকন্যায় ক্লিনিক খোলা হয়েছে,' বলল হাসান। 'একজন এমবিবিএস ডাক্তার আর দু'জন নার্স কাল এসে পৌঁচেছেন।'

শিরিন বলতে চাইল, শুনে সত্যি খুব খুশি হলাম। বলল, 'ডাক্তার যখন এসেছে, এবার তিনকন্যায় রোগেরও আমদানি ঘটবে।'

'তুমি একা থাকো তো, তাই ভাবলাম রাতের বেলা নার্সদের কাউকে শ্বেতবসনায় থাকতে বললে কেমন হয়।'

'না।'

'একা থাকতে তোমার ভয় করে না?'

'এ-সব প্রশ্নের উত্তর অনেক দিন আগে একবার আপনাকে দেয়া হয়েছে বলে মনে পড়ে,' জবাব দিল শিরিন। 'তিনকন্যায় আপনাকেই শুধু ভয় আমার।'

'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা একবার বলেছিলে বটে, কিন্তু তারপরই বলেছিলে—ঠাট্টা, সত্যি তা মনে করো না।'

দরজা থেকে চান্দা বলল, 'সই, ভাত বাড়ি?'

হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের জন্যে। এটা শিরিনের মনের কথা। মুখে বলল, 'না। হাসান সাহেব কথা শেষ করে আগে চলে যান।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। 'তোমার খেতে বসতে দেরি হলো বলে দুঃখিত।'

ওকে বসতে বলতে না পারায় কান্না পাচ্ছে শিরিনের। যদিও হাসছে সে, বলল, 'আবার আসবেন, বেছে বেছে এরকম অসময়ে, কেমন?'

হাসান চলে যাবার পর টেবিল সাজাতে শুরু করল চান্দা, আপনমনে গজগজ করছে সে।

'এই, চান্দা, বিড়বিড় করে কি বলছিস?' জিজ্ঞেস করল শিরিন।

'কি আবার বলব!' চান্দার গলায় ঝাঁঝ। 'যেচে পড়ে কেউ যদি অপমান হতে আসেন, কার কি বলার আছে।'

'কার কথা বলছিস?' বুঝেও না বোঝার ভান করল শিরিন।

'সই, রাত আটটার পর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটু তাকিয়ো আজ,' বলল চান্দা।

'কেন?'

'তাকিয়ে যদি দেখো বন্দুক হাতে তিনজন লোক টহল দিচ্ছে, ভয় পেয়ো না,' বলল চান্দা। 'ওরা তোমাকে পাহারা দেয়। সেই যখন থেকে পাহাড় কেটে কাজ শুরু হলো।'

'পাহারা দেয়? আমাকে? কি বলছিস তুই?'

'সেজন্যেই গজগজ করছি। পাহারার ব্যবস্থা হাসান সাহেবই করেছেন। তারপর আবার নার্সের কথা বলতে আসার কি দরকার ছিল? শুধু শুধু অপমানিত হওয়া।'

প্রতি হপ্তায় অন্তত একবার শ্বেতবসনায় আসেই হাসান। এক হপ্তা পার

হয়ে গেল। তারপর দু'হপ্তা। ওর দেখা নেই। চান্দাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারে না শিরিন। এভাবে এক মাস পার হয়ে গেল। তারপর চান্দাই একদিন বলল, 'এবার সত্যি সত্যি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সই।'

'কেন, কি হয়েছে?' জানতে চাইল শিরিন।

'হাসান সাহেব টাকা আনার জন্যে জাপানে গেছেন। বলে গেছেন পনেরো দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। এক মাস তিন দিন আজ, ফিরছেন না। বোধহয় টাকা যোগাড় হয়নি। ঠিকাদাররা বলছে আর এক হপ্তাহ দেখবে তারা, তারপর কাজ বন্ধ করে দেবে।'

চান্দা চলে যাবার পর শিরিনের মাথায় ভূত চাপল। বাক্স খুলে আম্মুর বোরকাটা বের করল সে। হাসান তিনকন্যায় নেই, এই সুযোগে ট্যুরিস্ট সেন্টারের নামে তিনকন্যার কি অবস্থা করা হয়েছে দেখে আসবে সে। তারপর ভাবল, এই দুপুর বেলা বোরকা পরলে সাংঘাতিক গরম লাগবে। তাছাড়া, নিচে এখন কয়েকশো লোক কাজ করছে, কে কি ভেবে বসে বা বলে বসে। তারচেয়ে কাল খুব ভোরে যাবে সে, আগে যেমন হাঁটতে যেত।

ধাপ বেয়ে পাহাড় থেকে নামার সময় প্রথমেই চোখে পড়ল উল্টোদিকের পাহাড়ের ঢালে তৈরি কটেজগুলো। সেগুলো এত সুন্দর, ঠিক যেন ছবির মত, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল শিরিন। প্রতিটি কটেজ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, বেড়ার গায়ে পর্দার মত ঝুলে আছে বিদেশী কোন লতা গাছ। কটেজের ভেতর যে যাই করুক, বাইরে থেকে তা দেখা যাবে না। ঘরগুলো লাল সেরামিক ইঁট গেঁথে তোলা হয়েছে। কংক্রিটের ছাদ, তবে সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে ছাদের ওপর একটা কাঠামো খাড়া করে তাতে সাজানো হয়েছে লাল টালি। প্রতিটি কটেজের সামনে ছোট্ট লন আর বাগান।

পাহাড় থেকে নিচে নামার পর বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না শিরিনের। ক্লিনিকটাকে ছোটখাট একটা হাসপাতালই বলা যায়। বিশাল

এক সাইনবোর্ড ঝুলছে সাদা চুনকাম করা বিল্ডিংটার মাথায়—তিনকন্যা দাতব্য চিকিৎসালয়। জানালা দিয়ে উঁকি দিতে ডিসপেনসারিটা দেখতে পেল সে, ওষুধ-পত্রে ঠাসা। দুটো কামরায় চারটে করে আটটা বেড।

তার দম আটকে এল হোটেল আর শপিং সেন্টার দেখে। হোটেলটা যে চারতলা, কেউ তাকে বলেনি। সামনে সবুজ লন—এত সুন্দর ঘাস কোত্থেকে এল বলতে পারবে না সে। এক পাশে গাড়ি পার্ক করার জন্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। আরেক পাশে ঘেরা বাগান। মূল ফটক দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর সামনে পড়বে প্রকাণ্ড একটা ফোয়ারা। বন্দুক হাতে দু'জন গার্ডকে দেখে ফটক থেকেই ফিরে এল শিরিন, ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না।

যতই দেখছে সে ততই তিনকন্যাকে অচেনা লাগছে তার। মাত্র এক বছরের মধ্যে এরকম পরিবর্তন আশা করা যায় না। হোটেল, শপিং সেন্টার, ক্লিনিক, পোস্টঅফিস, স্কুল ছাড়াও অনেকগুলো বিল্ডিঙের কাজ চলছে। প্রতিটি বিল্ডিঙের সামনে পাকা রাস্তা। হোটেলের সামনে থেকে সৈকত পর্যন্ত পাকা চাতাল তৈরি করা হয়েছে, সেই চাতাল চওড়া একটা রাস্তার আকৃতি নিয়ে সোজা চলে গেছে সৈকতের ওপর দিয়ে পানির কিনারা পর্যন্ত। রাস্তার পাশে কৃত্রিম একটা লেক দেখে হাঁ হয়ে গেল শিরিন। তারপর ভেঁপুর আওয়াজ শুনে বুকটা ধক করে উঠল তার। তাকিয়ে দেখে লম্বা এক জেটির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল একটা স্টীমার। ভোর বেলাই কাজ শুরু করে দিয়েছে লেবাররা, স্টীমার থেকে সিমেন্টের বস্তা নামাচ্ছে তারা।

ঘুরে ফিরে সব দেখতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দোচালা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে লেবাররা, প্যান্ট-শার্ট পরা কয়েকজন ভদ্রলোককেও দেখতে পেল শিরিন। তার ইচ্ছে হলো আরও কিছুক্ষণ থাকে, কিন্তু লোকজন যেভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে, সাহস হলো না। খুঁতখুঁতে একটা ভাব নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে—এলিভেটর দেখা বাকি থেকে গেল। ভাবল, কাল আবার আসবে।

ধাপ বেয়ে ওঠার সময় হাঁপিয়ে গেল শিরিন। কারণটা বুঝতে পারল সে। এক বছর হতে চলল পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করে না। একটু থেমে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল।

একটা ধাপের ওপর বসে আছে শিরিন, হঠাৎ চিনতে পারল জায়গাটা। ঠিক এইখানেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল হাসানের। এত থাকতে ঠিক এখানেই কেন বিশ্রাম নিতে বসল সে? তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তারপর আর পা চলে না। ঠিক সেই প্রথম দিনের মত হাসানকে নেমে আসতে দেখল শিরিন।

বোরকা পরে থাকায় হাসান তাকে চিনতে পারেনি। পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে ইচ্ছে করল শিরিনের, যদিও তাকাতে পারল না। সে ভাবছে, কখন ফিরল হাসান? ভাগ্যিস বোরকা পরে বেরিয়ে ছিলাম। কয়েকটা ধাপ উঠে আসার পর স্বস্তিবোধ করল সে। যাক বাবা, হাসান তাকে সত্যি চিনতে পারেনি।

এই সময় পিছন থেকে হাসান বলল, 'কে? শিরিন, তুমি?'

শিরিন জবাব দিল না, থামলও না। তার বুকের ভেতরটা ধকধক করছে। হায় হায়, শেষ পর্যন্ত চিনে ফেলল নাকি? কান পাতল সে। না, হাসান তার পিছু নেয়নি। শ্বেতবসনায় ফিরেই বোরকা খুলে লুকিয়ে ফেলল।

নিজের রোগ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন শিরিন। সুস্থ হবার ব্যাকুলতাও তার আছে। একটু বেলা হতে চান্দা শ্বেতবসনায় এসে দেখল, ফ্রিজ থেকে রাজ্যের মাছ-মাংস তরি-তরকারি বের করে নিজেই রাঁধতে বসেছে শিরিন। 'সই, একি করছ তুমি?'

'আজ আমি রাঁধব,' হাসতে হাসতে বলল শিরিন। 'কোর্মা, পোলাউ, রেজালা, গলদা চিংড়ির দোপেঁয়াজা, যা যা জানি সব।'

গালে হাত দিল চান্দা। 'কার জন্যে, সই? কে আসবে গো?'

শিরিনের ধারণা, হাসান আসবে। সে যদি নিমন্ত্রণ করতে না-ও পারে, চান্দাকে এমনভাবে প্ররোচিত করবে, ও-ই হাসানকে নিজে

থেকে ডেকে আনবে। 'কেন, তিনকন্যায় এমন কেউ নেই, যাকে নিমন্ত্রণ করা যায়?'

'তিনকন্যায় কে আছে···?' মাথা ঝাঁকাল চান্দা। 'সেরকম আমি তো কাউকে দেখছি না।'

শিরিন ভাবল, মাঝেমধ্যে একদম বোকা বনে যায় চান্দা। এই যেমন এখন। সে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখ। সবাই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন একজনকে খুঁজে বের কর। তারপর যা, তাকে দাওয়াত দিয়ে আয়।'

'সই, তোমার কি হয়েছে বলো তো? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।' চান্দা হতভম্ব।

'বুঝতে না পারলে চুপ করে বসে থাক!' রেগে যাচ্ছে শিরিন। 'এত করে বলছি তোর যাকে খুশি নিমন্ত্রণ কর, বলে কিনা আমার কথা বুঝতে পারছে না। কেন, এ-বাড়িতে খেয়ে গেছে এমন লোক তিনকন্যায় নেই?' তারপর, একটু থেমে, জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, হাসান জাপান থেকে কবে ফিরল বলতে পারিস? কালই তো শুনলাম···।'

'কাল রাতে ফিরেছে। আমি যাই তাহলে, বলে আসি···,' চলে গেল বললে বোধহয় ভুল হবে, চান্দা আসলে পালিয়ে গেল।

দুপুরে টেবিল সাজাল চান্দা। রান্নার কাজে শিরিনকে সাহায্য করলেও ওদের মধ্যে তেমন কোন কথা হয়নি। হাসানকে দাওয়াত দিয়ে এসেছে ও, তবে শিরিনকে সে-কথা এখনও বলেনি। শিরিনও কিছু জানতে চায়নি। চান্দার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনার ভাব দেখে সে ধরে নিয়েছে হাসানকেই দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। বেলা ঠিক দুটোর সময় হাজির হলো হাসান। ওকে দেখেই হেসে উঠল শিরিন। 'আজও আবার সেই অসময়ে?' কথাটা যে কখন কিভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বলতে পারবে না সে। বলার পর এখন নিজের মুণ্ডুপাত করছে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। বোকা

বোকা লাগছে তাকে। একবার শিরিনের দিকে, পরক্ষণে চান্দার দিকে তাকাচ্ছে।

'দাঁড়িয়ে কেন, এসেই যখন পড়েছেন, ভেতরে ঢুকুন,' বলল শিরিন। 'নিশ্চয়ই নতুন কোন খবর দিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, নতুন একটা খবর আছে বটে,' খানিকটা এগিয়ে এসে বলল হাসান, তবে বসল না। 'টাকা পয়সার যে সমস্যা ছিল, সব দূর হয়েছে। জাপানে আমার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমি বিক্রি করে দিয়েছি। কাজ শেষ করতে আর দু'মাসের বেশি লাগবে না। শুভ উদ্বোধনের একটা তারিখও ঠিক করেছি। কার্ড ছাপতে দেব তো, তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম। তোমার মনে আছে তো, শীরীন ট্যুরিস্ট সেন্টারের উদ্বোধন তোমাকেই করতে হবে?'

'অসম্ভব।'

'তুমি উদ্বোধন করবে, এই কথাই লেখা থাকবে কার্ডে,' বলল হাসান। 'তবু যদি না করো, এমন একটা কাণ্ড করব আমি, সারাজীবন তোমাকে কাঁদতে হবে।'

'পুরানো কথা, আগেও শুনেছি। আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?'

চান্দার দিকে তাকাল হাসান। 'শুনলাম আমাকে খাওয়াবে বলে আজ সারা বেলা নিজের হাতে কি কি সব রান্না করেছ। শুনেই চলে এলাম। আমাকে তুমি বসতে বলছ না কেন?'

'আপনাকে খাওয়াব? আপনাকে খাওয়াব বলে রান্না করেছি?' হেসে উঠল শিরিন। 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি?'

'কি, চান্দা?' জিজ্ঞেস করল হাসান।

চান্দাকে হতভম্ব দেখাল। 'সই, তুমিই তো আমাকে বললে যে···।'

'ঠিক কি বলেছি ভাল করে মনে করে দেখ,' ধমকের সুরে বলল শিরিন। 'আমার কথা ভাল করে না বুঝে এই বিচ্ছিরি কাণ্ড তুই করতে গেলি কেন? তোর কি কোনদিনই আক্কেল হবে না?'

'সই, তুমি আমাকে বললে সবাই ভালবাসে, সবাই শ্রদ্ধা করে এমন একজনকে দাওয়াত দে। তাই তো আমি ভাবলাম···।'

'আর আমার এই কথা শুনে তুই ধরে নিলি আমি ওঁনাকে দাওয়াত দিয়েছি? আরে বোকা, সবাই কি শুধু একা ওঁকে শ্রদ্ধা করে? আমি তো আসলে মান্না কাকুর কথা বলতে চেয়েছি। মানুষটা বুড়ো হয়ে এল, আমাদের সেবায় সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছে, বিয়ে করে সংসারী পর্যন্ত হলো না। কেন, তুই তাকে শ্রদ্ধা করিস না?'

চোখে অবিশ্বাস, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল চান্দা।

'কিন্তু মান্না শেখ তো কক্সবাজারে গেছে,' বলল হাসান। 'তাছাড়া, আমি যখন ঠিক সময়ে এসেই পড়েছি, ভাল-মন্দ গলধঃকরণের এই সুযোগটা ছাড়ি কেন?'

'আমি আপনাকে খেতে বলছি না,' বলল শিরিন। 'তবু আপনি খাবেন?'

'অসুবিধে কি।' হাসান হাসছে। 'ধরে নাও আমিই মান্না শেখ।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'হ্যাঁ।' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল হাসান। 'দেখি তুমি আমাকে না খাইয়ে পারো কিনা।'

'ডেকে যখন এনেছিস, তুই-ই খাওয়া,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল শিরিন, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে।

এমন কাণ্ড করব, তোমাকে সারাজীবন কাঁদতে হবে—কথাটা হাসান শুধু মুখে বলেনি, কাজেও প্রমাণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুভ উদ্বোধন দশ দিন বাকি থাকতে ওর চিঠি পেয়ে ঢাকা থেকে তিনকন্যায় ফিরল তারিন। দু'দিন পর একটা গুজব রটল গোটা এলাকায়—উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিরিন যদি ফিতে না কাটে, এবং হাসানকে সে যদি প্রত্যাখ্যান

করে, শীরীন ট্যুরিস্ট সেন্টার শিরিনকে দান করে একবস্ত্রে তিনকন্যা ত্যাগ করবে ও। গুজবটা যে মিথ্যে নয়, তারিনকে হাসান দানপত্রের খসড়া তৈরি করতে বলায় সবাই তা জেনে ফেলল। তারিনকে ছেকে ধরল সবাই, একের পর এক প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তারিন জানাল, অনেক বুঝিয়েও হাসানকে সে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। সব ত্যাগ করে চলে যাবেই ও, শিরিন ছাড়া আর কেউ ওকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তারিন শুধু একটা কথা কাউকে জানাল না। সেটা হলো, শিরিন যে তরুণ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিল, তার কাছে হাসানকেও নিয়ে গিয়েছিল ও। সেই ডাক্তারই হাসানকে এই পরামর্শ দিয়েছে। বলেছে, 'সব ত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে যান, তবে যদি আপনার আশা পূরণ হয়। তবে আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি না। আপনি সব ছেড়ে চলে গেলে উনি অর্থাৎ শিরিন হায়দারও তিনকন্যা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন। তবে সম্ভাবনা আছে আপনাকে অনুসরণ করতে পারেন তিনি।'

দানপত্রে শিরিনকে সব দিয়ে যাচ্ছে হাসান, কথাটা শিরিনের কানেও উঠল। 'পাগল নাকি? ও আমার কে যে ওর জিনিস নেব আমি?' হেসে উঠল সে। 'দিলেই হবে নাকি, আমি নিলে তো!'

'তুই না নিলেও ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যাবে না,' তাকে বলল তারিন। 'দান-পত্রে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আমার নাম থাকবে। কি আর করা, দেখেশুনে রাখতে হবে আমাকেই। দেয়ার পর হাসান তো আর ফেরত চাইলেও ফেরত পাবে না, দলিল-পত্র সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে।'

'ও তাহলে সত্যি পাগল, না রে?' সকৌতুকে জানতে চাইল শিরিন।

'হ্যাঁ, তোর জন্যে।'

'আহা, বেচারির জন্যে সত্যি মায়া হয়,' বলল শিরিন। 'তা সব ছেড়ে যাচ্ছেটা কোথায়?'

'খেয়ে-পরে বাঁচতে তো হবে, তাই কক্সবাজারে এক সওদাগরী অফিসে কেরানীর চাকরি ঠিক করেছে।'

'কি বললি!'

'তাছাড়া আর কি করবেই বা,' বলল তারিন। 'সঞ্চয় যা ছিল, কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক লোন, সবই তো ইনভেস্ট হয়ে গেছে ট্যুরিস্ট সেন্টারে। কিভাবে কি করবে সব ঠিক করে ফেলেছে ও। উদ্বোধনের জন্যে দু'ধরনের কার্ড ছাপা হয়েছে। একটায় লেখা আছে তুই উদ্বোধন করবি। আরেকটা লেখা আছে হাসান নিজে উদ্বোধন করবে। তুই যদি যাস, হাসান ধরে নেবে ওকে তুই ভালবাসিস। আর যদি না যাস, পরদিন রাতে রাজহংসে চড়ে তিনকন্যা ত্যাগ করবে।'

'রাজহংসে চড়ে কেন?'

'বলছে, রাজহংসে চড়েই প্রথমদিন তিনকন্যায় এসেছিল, তাই।'

'বাহ্!' প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠার ভঙ্গি করল শিরিন। 'ও এমন সেন্টিমেন্টাল তা তো জানা ছিল না!'

'তোর খুব খুশি লাগছে, না?' জিজ্ঞেস করল তারিন।

'তা একটু একটু লাগছে বৈকি,' ঠোঁট টিপে হাসল শিরিন। 'আপদ বিদায় হচ্ছে।'

'সত্যি আপদ ভাবছিস, নাকি এটা সেই তোর রোগ?'

খিল খিল করে হেসে উঠল শিরিন।

'ইচ্ছে হচ্ছে কাঁদতে, কিন্তু হাসছিস?'

মাথা নাড়ল শিরিন, এখনও হাসছে। 'না।'

'বলতে চাইছিস হ্যাঁ, কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন তোকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে না?'

'এই তারিন, তোরা সবাই আমার হাতে-পায়ে ধরছিস না কেন?' হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল শিরিন। 'সবাই মিলে চেপে ধর, তাহলে হয়তো আমি ফিতে কাটতে যেতেও পারি। হয়তো বলেও বসতে পারি, হাসানকে আমি ভালবাসি।'

শুভ উদ্বোধনের দিন তিনকন্যার সবাই করলও ঠিক তাই। আদিবাসীরা সবাই এল, এল ইঞ্জিনিয়াররা, এমনকি শ্রমিকরাও বাদ গেল

না। কিন্তু দোতলায় নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকল শিরিন, কারও ডাকেই সাড়া দিল না। হাসানকেও এসে ফিরে যেতে হলো।

একটু বেলা হতেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। ফিতে কাটল হাসান। প্রথম দিন দেশী পর্যটক এসেছে শুধু চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি থেকেই বাহাত্তর জন। কক্সবাজার থেকে এলেন বিদেশী পর্যটকরা। তাঁরাও সংখ্যায় অনেক। কটেজ আর হোটেলের কামরা আগে থেকেই বুক করা ছিল, দুপুরের দিকে শীরীন ট্যুরিস্ট সেন্টার গমগম করতে লাগল। হোটেলের নাম রাখা হয়েছে হাসানের মায়ের নামে—মৌসুমী। মৌসুমীর জলসাঘরে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়েছে, একনাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা বিরতিহীন চলবে। বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট সকালের দিকে পৌঁছুলেও, দু'চারজন করে সারাদিনই এল তারা। প্রথম দিনেই শপিং সেন্টারে এত ভাল বেচা-কেনা হলো, প্রায় খালি হয়ে গেল দোকানগুলো। রাতারাতি ছোট একটা শহরে পরিণত হয়েছে তিনকন্যা। সৈকতে খানিক পর পর বিশাল আকৃতির ছাতা রাখা হয়েছে, সেগুলোর নিচে বসে সাগরের বাতাস খাচ্ছে দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টরা। ছোট কয়েকটা বোটে চড়ে সাগরে বেড়াচ্ছেও অনেকে। চারদিকে উৎসব উৎসব ভাব। সবাই খুব ব্যস্ত। একা শুধু হাসান বিষণ্ন।

কারও সঙ্গে কথা বলছে না ও। কোন কাজও করছে না। ফিতে কাটার পর সৈকত ধরে একা হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে চলে গিয়েছিল, হোটেলের সামনে থেকে সেদিকে তাকিয়ে খুদে একটা কালো বিন্দুর মত ওকে দেখতে পাচ্ছিল তারিন। হাসান ফিরতে শুরু করেছে দেখে শ্বেতবসনায় উঠে আসে ও। বিব্রত করা হবে ভেবে ওর সামনে পড়তে চায়নি।

পরদিন বিকেলে শিরিনের সঙ্গে দেখা করতে এল হাসান। আজই ওর তিনকন্যায় শেষ দিন। শিরিনের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে ও।

না, শিরিনকে পাবার আশা অনেক আগেই ত্যাগ করেছে হাসান, কাজেই আজ কোন অনুরোধ করবে না। শিরিন ওকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে, তার ভালবাসা কোনদিনই ও পাবে না। আর ভালবাসা এমন একটা ব্যাপার, জোর করে আদায় করা যায় না। মুখে যা-ই বলুক হাসান, মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে ও। শিরিনের প্রত্যাখ্যান মেনে নিয়েছে। সেজন্যেই সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভালবাসা যেখানে অনন্ত অসীম, ব্যর্থতা সেখানে মানুষকে সুস্থ থাকতে দেয় না। সব ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে চলে যাবার ওর এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক নয়, বোঝে হাসান। কিন্তু এ-ও বোঝে যে যতদিন বেঁচে থাকবে ওর পক্ষে কোনদিনই আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না।

শ্বেতবসনায় ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল তারিন। 'শিরিন নেই,' হাসানকে বলল ও। 'জানতেও পারিনি কখন ভোর বেলা কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে সে।'

'চলে গেছে?' স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল হাসান। 'কি বলছ? কোথায় গেছে? তার কোন বিপদ হয়নি তো? খোঁজ করোনি?'

'খোঁজ করতে হবে কেন,' বলল তারিন। 'সে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।'

'কই, চিঠিটা আমাকে দেখাতে পারো?'

'দেখে কি হবে। মাত্র দুটো লাইন লিখে রেখে গেছে—আমার খোঁজ করার দরকার নেই। যেখানেই থাকি, জানবি আমি ভাল আছি।'

'ব্যস, আর কিছু না? আমার কথা কিছু লেখেনি?'

ম্লান চেহারা, মাথা নাড়ল তারিন।

'আমি তাহলে যাই…।'

'হাসান, তুমি বসবে না?' পিছন থেকে ডাকল তারিন।

'না।'

'তুমি কি…?'

'হ্যাঁ, চলে যাব।'

'এখুনি?'

'না। সন্ধে পর্যন্ত দেখব। শিরিন ফিরলে শেষ একবার দেখা করব।'

এতদিন ধরে যারা তিনকন্যায় আছে বা কাজ করেছে সবাই তারা শোকে কাতর। তবু কারও আর কিছু করার নেই। হাসানকে তারা অনেক বুঝিয়েছে, অনেক কান্নাকাটি করেছে, কোন লাভ হয়নি। সিদ্ধান্তটা আজ হঠাৎ করে নেয়নি হাসান, ওর চলে যাবার ব্যাপারটা মেনে নেয়ার জন্যে মানসিক ভাবে তৈরি হবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে তারা। তাছাড়া, হাসান তাদেরকে একটা ব্যাপারে কঠিন ভাষায় সাবধান করে দিয়েছে, কেউ যেন ট্যুরিস্টদের প্রতি অবহেলা না দেখায়। ট্যুরিস্ট হলো লক্ষ্মী, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই নিজেদের স্বচ্ছলতা নির্ভর করবে।

রাত আটটা বাজতে চলল। মান্না শেখকে শ্বেতবসনায় খবর নিতে পাঠাল হাসান। মান্না শেখের সঙ্গে সৈকতে নেমে এল তারিন। না, শিরিন ফেরেনি।

ওদের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত হেঁটে এল তারিন। প্রথমে রাজহংসে চড়ল মান্না শেখ। অনেক কষ্টে কান্না চেপে রেখেছে তারিন। শুধু বলতে পারল, 'ডাক্তারের আশঙ্কাটাই সত্যি-প্রমাণিত হলো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করল হাসান। 'কিছুদিনের জন্যে কোথাও পালিয়ে গেছে শিরিন। সে হয়তো ভেবেছে যাব বললেও আসলে হয়তো যাব না আমি। যখন শুনবে সত্যি আমি চলে গেছি, তখন আবার সে ফিরে আসবে।'

'তুমি কি আর কোনদিনই তিনকন্যায় ফিরবে না?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল তারিন।

'না।'

'কক্সবাজার তো কাছেই। একটা বছর এত কঠিন পরিশ্রম করে এই যে এ-সব তৈরি করলে, তোমার দেখতে ইচ্ছে করবে না?'

'সে ইচ্ছে যাতে না হয়, দেশ ছেড়ে চলে যাব আমি,' বলল হাসান। 'কক্সবাজারের চাকরিটা করব না। ওদেরকে বলে দিয়েছি। কাল সকালেই আমি ঢাকায় চলে যাব। তারপর দেখব আবার জাপানে যেতে পারি কিনা।'

'তোমার শীরীনের কি হবে? সে তো এ-সব নেবে না।'

'জানি নেবে না। কোন এতিমখানাকে দান করে দিতে বোলো।'

হাসানের একটা হাত ধরল তারিন। 'আমাদের কথা একদম ভুলে যাবে তুমি? ভুলে যেতে পারবে?'

তিক্ত হাসি ফুটল হাসানের ঠোঁটে। 'এবার আমাকে যেতে দাও।'

হাতটা ছেড়ে দিল তারিন। জেটি থেকে রাজহংসে চড়ল হাসান।

এক ঘণ্টা হলো তিনকন্যা থেকে রওনা হয়েছে রাজহংস। জোরাল দমকা বাতাস শুরু হওয়ায় অশান্ত সাগরে বড় বড় ঢেউ। ট্রলার খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে, গতি একদম মন্থর। কক্সবাজারে পৌঁছুতে আরও দু'ঘণ্টা লাগবে ওদের। ঘুমানোর কথা বলে নিচের কেবিনে নেমে এল হাসান। আলো জ্বেলে বাঙ্ক-এর ওপর বসল, হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ডেকে। খানিক পর ব্যাগটা খুলে হুইস্কির একটা বোতল বের করল হাসান। তারপর হাতে নিল স্লিপিং ট্যাবলেটের একটা শিশি। বোতলটা রাখল টেবিলের ওপর। টেবিলের পায়াগুলো ডেকের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। শিশিটা রাখল নিজের পাশে বাঙ্ক-এর ওপর। ভাবছে, কোনটা খাবে। মদ সে জীবনেও খায়নি। তবে শুনেছে মদ খেলে সব নাকি ভুলে থাকা যায়। বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে ওর আন্তর্জাতিক মানের হোটেলে প্রচুর মদ আনা হয়েছে, সেখান থেকেই এই বোতলটা সংগ্রহ করেছে ও। ভাবল, নাকি ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে?

এক কাজ করলে হয়। দুটোই খাবে। প্রথমে হুইস্কি, তারপর ঘুমের ওষুধ। নাকি আগে ট্যাবলেট, পরে হুইস্কি?

বোতলটা খুলল হাসান। আপন মনে বিড়বিড় করছে। অসুস্থ তো

আমিও। জোর করে কি আর ভালবাসা পাওয়া যায়? নিজের কাছে নিজের অপরাধ চাপা থাকে না। শিরিনকে আমি ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছি। কোন উপায় না দেখে পালিয়েছে সে। কে জানে সে এখন কোথায়! তবে প্রায়শ্চিত্তটা যথাযথ হচ্ছে। আমি চলে গেছি শুনলে নিশ্চয়ই সে তিনকন্যায় ফিরে আসবে। থাকুক, সে শান্তিতে থাকুক। জীবনে আর কোনদিন আমি তার সামনে দাঁড়াব না। তবে দেশ ছাড়ার পর তাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। আরও লিখতে হবে, তাকে সারাজীবন কাঁদাবার জন্যে নয়, বরং আমি যে তার উপযুক্ত নই এই উপলব্ধি হওয়াতেই সব ছেড়ে চলে এসেছি।

বোতল থেকে সরাসরি হুইস্কি খেলো হাসান। স্বাদটা মোটেও উপভোগ্য নয়। এই জিনিস মানুষ খায় কিভাবে? ও কি প্রথমবারেই খুব বেশি খেয়ে ফেলেছে? সারা শরীর গরম লাগছে তার। সেই সঙ্গে ভাল লাগার একটা অনুভূতি জাগছে মনে। নাক কুঁচকে আরও খানিকটা হুইস্কি খেলো ও। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, আজ আঘাতটা সামলাবার জন্যে প্রয়োজন আছে, তাই খাচ্ছি। আজই শেষ, আর কোনদিন খাব না।

তারপর ভাবল, শিরিন তুমি কোথায়? আশ্চর্য, মাতাল হয়েও তো তোমাকে ভুলতে পারছি না! কি জানো, তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু জানা হলো না আমার অপরাধটা কি। বলো, কী আমার অপরাধ? এই শিরিন, এই, কিছু বলছ না কেন?

হাসান কেবিনে ঢোকার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ওর প্রতিটি নড়াচড়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে শিরিন। সেই ভোর অন্ধকার থাকতে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাজহংসের এই কেবিনে ঢুকে টেবিলের তলায় লুকিয়ে আছে সে। হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে, সারা শরীর আড়ষ্ট।

'এই শিরিন, কথা বলছ না কেন? বলো আমার কী অপরাধ!' বিড়বিড় করছে হাসান।

'না,' বলে টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল শিরিন। 'তোমার কোন অপরাধ নেই।'

চমকে উঠল হাসান। 'কে?' শিরিনকে দেখে পাথর হয়ে গেল।

শিরিনের দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। সে বারবার থেমে থেমে একটা শব্দই শুধু উচ্চারণ করতে পারছে, 'না···না···।'

'না মানে?' হেসে উঠল হাসান।

'তুমি এ-সব খেতে পারবে না।' বোতলটা হাসানের হাত থেকে কেড়ে নিল শিরিন।

'বেশ তো, তুমি যখন নিষেধ করছ, খাব না!'

'না···।' হাসানের গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছে শিরিন। 'না···।'

হাসান যে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে তা নয়, তবে শিরিনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার মুখটা দেখতে চাইছে ও। কিন্তু শিরিন সরছে না, আরও বরং ঢলে পড়ছে ওর গায়ে। 'না মানে?'

'তুমি কোথাও যেতে পারবে না···!' ফোঁপাচ্ছে শিরিন।

'বেশ তো···!' হঠাৎ থেমে গেল হাসান। বাঙ্ক ছেড়ে সিধে হলো। দু'হাত দিয়ে শিরিনের কাঁধ খামচে ধরল। 'তুমি সত্যি? স্বপ্ন নও? সত্যি তুমি শিরিন? নাকি আমি মাতাল হয়ে গেছি?'

শিরিন তার মুখটা হাসানের মুখে ঘষছে। 'না···।'

'কি না?' হাসানের গলায় ভয় ও সন্দেহ।

'তুমি মাতাল হওনি। আমি সত্যি।'

এক ঝটকায় শিরিনকে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এল হাসান। 'বুঝতে দাও! আমাকে বুঝতে দাও! সত্যি কথা বলো, কে তুমি?'

'হাসান!' এবার শক্ত হয়ে গেল শিরিনের সারা শরীর। 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

'কেন চিনতে পারব না। তোমার জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আমি ভুল দেখছি কিনা। তোমাকে আমি চিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি কি সত্যি

আমার সামনে? তা কি করে হয়?'

শিরিন ফুঁপিয়ে উঠল। 'না···না···।'

'বুঝিয়ে বলো! কি বলতে চাও বুঝিয়ে বলো···।'

'না। তুমি কোথাও যাচ্ছ না।' হাসানের চোখ মুছিয়ে দিল শিরিন। 'ওদেরকে বলো, ট্রলার ঘুরিয়ে নিক।'

'এর মানে কি, শিরিন?' হাসান চিৎকার করে উঠল। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি শিরিন। কিন্তু তুমি আমার নও। কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোমাকে পেলাম না। কি করে পাব, আমি তো তোমার উপযুক্ত নই···।'

'না···না···।' দুটো মুখ এক হয়ে আছে, হাসানের চোখের জল আর শিরিনের চোখের জল এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। শিরিন এখন ফোঁপাচ্ছে না। হাসানের ভেজা মুখে তার ঠোঁট। সে ভয় পাচ্ছে। হাসান কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে? 'যা কিছু ঘটেছে, সবকিছুর জন্যে আমি দায়ী। বিশ্বাস করো, মুখে যা বলেছি তার সবই ছিল মিথ্যে। তুমি যেদিন থেকে আমাকে চেয়েছ, আমি সেদিন থেকেই তোমার।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল হাসান। 'না, তা কি করে হয়!' উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'কি করে তোমার এ-কথা বিশ্বাস করি!'

'তাহলে বলে দাও কিভাবে বিশ্বাস করাব।'

'শিরিন! শিরিন! আমাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরো! এত জোরে, যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কি ছাই খেলাম, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! আরও শক্ত কোরে, প্লীজ! একদম পিষে ফেলো আমাকে!'

শিরিনের মনে হলো, কে যেন উঁকি দিল দরজায়। সেদিকে খেয়াল নেই তার, বাঙ্কে বসে হাসানকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে সে। 'একটু শান্ত হও, লক্ষ্মীটি,' বিড়বিড় করছে সে। কোন লজ্জা নেই, ঠোঁট বুলাচ্ছে হাসানের কপালে আর চোখে।

খানিক পর হাসান বলল, 'আমি একটু পরীক্ষা করে দেখি?' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শিরিনকে একটা হালকা চুমো খেলো ও। তারপর আবার

বলল, 'তুমি তাহলে সত্যি আমার সঙ্গে কক্সবাজারে যাচ্ছ? ডাক্তারের কথাই তাহলে ঠিক। তুমি আমাকে অনুসরণ করছ, তাই না?'

'না।'

'তাহলে রাজহংসে কি করছ তুমি?'

'তোমাকে তিনকন্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।' আবার হাসানকে জড়িয়ে ধরল শিরিন।

'কিন্তু ফিরে গিয়ে আর কি লাভ? আমি তো সবই দান করে দিয়েছি।'

হাসানের নাকে নাক ঘষল শিরিন। 'সেজন্যেই তো আমাকে পেলে।'

হঠাৎ আঁতকে উঠল হাসান। 'আরে, রাজহংস ঘুরে যাচ্ছে কেন? টের পাচ্ছ না?'

হেসে উঠল শিরিন। 'কেন টের পাব না। এই মাত্র মান্না কাকুকে দরজার সামনে দেখলাম। আমাকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে কাকু।'

'আর তাই রাজহংস ফিরে যাচ্ছে তিনকন্যায়?'

'হ্যাঁ। তোমার কি আপত্তি আছে, হাসান?'

'নেই, যদি কথা দাও চিরকাল এভাবে বেঁধে রাখবে তুমি আমাকে। এবং ক্ষমা করবে আমার সমস্ত অপরাধ।'

'না...,' হাসানের ঠোঁটে হাত চাপা দিল শিরিন। 'না...।'

***